অষ্টবিংশতি অধ্যায়

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন সম্বন্ধে কপিলদেবের উপদেশ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজস্য নৃপাত্মজে ।
মনো যেনৈব বিধিনা প্রসন্নং যাতি সৎপথম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যোগস্য**—যোগ-পদ্ধতির; **লক্ষণম্**—বর্ণনা; **বক্ষ্যে**—আমি বর্ণনা করব; **সবীজস্য**—প্রামাণিক; **নৃপ-আত্ম-জে**—হে রাজপুত্রী; **মনঃ**—মন; **যেন**—যার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিধিনা**—অভ্যাসের দ্বারা; **প্রসন্নম্**—প্রসন্ন; **যাতি**—লাভ করে; **সৎ-পথম্**—পরম পথ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মাতঃ! হে রাজপুত্রী! এখন আমি আপনার কাছে যোগের লক্ষণ বর্ণনা করব, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে একাগ্র করা। এই পন্থা অনুশীলনের ফলে, মানুষ প্রসন্ন হতে পারে এবং পরম সত্যের পথে অগ্রসর হতে পারে।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ভগবান কপিলদেব যে-যোগের পন্থা বর্ণনা করেছেন তা প্রামাণিক এবং আদর্শ। অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে এই উপদেশগুলি পালন করা উচিত। সর্ব প্রথমে ভগবান বলেছেন যে, যোগ অনুশীলনের দ্বারা মানুষ পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার পথে অগ্রসর হতে পারে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে

স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কতগুলি আশ্চর্যজনক যোগসিদ্ধি লাভ করা যোগের অভিলষিত ফল নয়। এই প্রকার সিদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া একেবারেই উচিত নয়, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার পথে ক্রমশ অগ্রসর হওয়া উচিত। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগী হচ্ছেন তিনি, যিনি নিরন্তর তাঁর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণভাবনাময়।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগ অনুশীলনের ফলে প্রসন্ন হওয়া যায়। পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেব, যিনি হচ্ছেন যোগ-পদ্ধতির সর্ব শ্রেষ্ঠ অধিকারি, তিনি এখানে যোগ-পদ্ধতির বিশ্লেষণ করছেন। এই যোগ-পদ্ধতি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি নামক আটটি অনুশীলন সমন্বিত বলে, একে অষ্টাঙ্গ-যোগ বলা হয়। এই সমস্ত স্তরের অভ্যাসের দ্বারা, সমস্ত যোগের চরম লক্ষ্য, ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে পরম উদ্দেশ্য। তথাকথিত বহু যোগ অভ্যাস রয়েছে, যাতে মানুষ শূন্য অথবা নির্বিশেষের ধ্যানে একাগ্র করার চেষ্টা করে, কিন্তু কপিলদেব বর্ণিত প্রামাণিক যোগ-পদ্ধতিতে তা অনুমোদন করা হয়নি। এমন কি পতঞ্জলিও বর্ণনা করেছেন যে, সমস্ত যোগের লক্ষ্য হচ্ছেন বিষ্ণু। তাই অষ্টাঙ্গ-যোগ বৈষ্ণব বিধির একটি অঙ্গ, কারণ তার চরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে উপলব্ধি করা। যোগের সাফল্য যোগসিদ্ধি লাভে নয়, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যার নিন্দা করা হয়েছে; পক্ষান্তরে, যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে, স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া। সেটিই হচ্ছে যোগের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ২

স্বধর্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্মাচ্চ নিবর্তনম্ ।
দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চনম্ ॥ ২ ॥

স্ব-ধর্ম-আচরণম্—নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা; **শক্ত্যা**—যথাসাধ্য; **বিধর্মাৎ**—বিরুদ্ধ ধর্ম; **চ**—এবং; **নিবর্তনম্**—পরিত্যাগ করে; **দৈবাৎ**—ভগবানের কৃপায়; **লব্ধেন**—যা লাভ হয়েছে; **সন্তোষঃ**—সন্তুষ্ট; **আত্ম-বিৎ**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা জীবের; **চরণ**—চরণ; **অর্চনম্**—পূজা করে।

অনুবাদ

মানুষের যথাসাধ্য স্বধর্ম আচরণ করা উচিত এবং বিধর্ম আচরণ পরিত্যাগ করা উচিত। ভগবানের কৃপায় তিনি যা প্রাপ্ত হন, তা নিয়ে তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত, এবং শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যবহার হয়েছে, যেগুলি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, কিন্তু সেই শব্দগুলির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি সম্বন্ধে কেবল আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। চরম বর্ণনাটি হচ্ছে *আত্মবিচ্চরণার্চনম্*। *আত্মবিৎ* মানে যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন বা সদ্‌গুরুদেব। আত্ম উপলব্ধি না হলে এবং পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত না হলে, সদ্‌গুরু হওয়া যায় না। এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করে তাঁর শরণাগত হতে (অর্চনম্), কারণ তাঁর কাছে প্রশ্ন করে এবং তাঁর আরাধনা করে, চিন্ময় কার্যকলাপ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা যায়।

প্রথম উপদেশ হচ্ছে *স্বধর্মাচরণম্*। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই জড় দেহটি রয়েছে, ততক্ষণ আমাদের বিভিন্ন ধর্ম আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মগুলি চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই সমস্ত বিশেষ ধর্মগুলির উল্লেখ শাস্ত্রে রয়েছে, বিশেষ করে *ভগবদ্গীতায়*। *স্বধর্মাচরণম্* মানে হচ্ছে তিনি যে বর্ণে রয়েছেন, শ্রদ্ধা সহকারে যথাসাধ্য সেই বর্ণের ধর্ম আচরণ করা। কখনই অন্যের ধর্ম গ্রহণ করা উচিত নয়। কেউ যদি কোন বিশেষ সমাজে বা গোষ্ঠীতে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন, তা হলে সেই বিশেষ শ্রেণীর জন্য যে ধর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে, তাই তাঁর আচরণ করা কর্তব্য। কিন্তু কেউ যদি আধ্যাত্মিক পরিচয়ের স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে, কোন বিশেষ সমাজে বা গোষ্ঠীতে জন্ম গ্রহণ করার উপাধি অতিক্রম করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন, তা হলে তাঁর স্বধর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। যিনি কৃষ্ণভক্তি স্তরে উন্নতি লাভ করেছেন, তাঁর প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত দেহাত্ম-বুদ্ধি স্তরে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক প্রথা অনুসারে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হন, তা হলে তাঁকে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হবে। এইটি হচ্ছে প্রকৃত স্বধর্ম আচরণ।

শ্লোক ৩

গ্রাম্যধর্মনিবৃত্তিশ্চ মোক্ষধর্মরতিস্তথা ।
মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্তক্ষেমসেবনম্ ॥ ৩ ॥

গ্রাম্য—প্রচলিত প্রথা অনুসারে; **ধর্ম**—ধর্ম আচরণ; **নিবৃত্তিঃ**—সমাপ্ত করে; **চ**—এবং; **মোক্ষ**—মুক্তির জন্য; **ধর্ম**—ধর্ম অনুশীলন; **রতিঃ**—আকৃষ্ট হয়ে; **তথা**—সেইভাবে; **মিত**—স্বল্প; **মেধ্য**—শুদ্ধ; **অদনম্**—আহার করে; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **বিবিক্ত**—নির্জনে; **ক্ষেম**—শান্তিপূর্ণ; **সেবনম্**—বাস করে।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রচলিত প্রথা অনুসারে তথাকথিত যে-ধর্ম আচরণ হয়, সেই সমস্ত গ্রাম্য ধর্ম পরিত্যাগ করে, মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় যে-মোক্ষ ধর্ম, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। মিতাহারী হয়ে সর্বদা নির্জন স্থানে বাস করা উচিত, যাতে জীবনে চরম সিদ্ধি লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের ধর্ম আচরণ না করতে এখানে অনুমোদন করা হয়েছে। জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্যই কেবল ধর্ম আচরণ করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে সেইটি যার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করা যায়। এই প্রকার ধর্মানুশীলন কোন রকম বাধা-বিপত্তির দ্বারা প্রতিহত হয় না, এবং এই ধর্ম আচরণের ফলে আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। এখানে তাকে *মোক্ষধর্ম*, মোক্ষের জন্য অনুষ্ঠিত ধর্ম, বা জড়া প্রকৃতির কলুষের বন্ধনের অতীত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য ধর্ম আচরণ করে, কিন্তু যিনি যোগমার্গে অগ্রসর হতে চান, তাঁর জন্য তা অনুমোদিত হয়নি।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হচ্ছে *মিতমেধ্যাদনম্*, অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত অল্প আহার করা। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যোগী যেন তাঁর ক্ষুধার মাত্রার অর্ধপরিমাণ কেবল আহার করেন। অর্থাৎ কেউ যদি এত ক্ষুধার্ত হন যে, তিনি এক সের খাদ্য ভোজন করতে পারেন, তা হলে এক সের খাদ্য আহার করার পরিবর্তে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে আধ সের খাদ্য আহার করা, এবং

বাকি অংশটি পূর্ণ করার জন্য এক পোয়া জল পান করা, এবং উদরের এক চতুর্থাংশ বায়ু গমনাগমনের জন্য খালি রাখা। কেউ যদি এইভাবে আহার করেন, তা হলে তাঁর কখনও বদহজম হবে না এবং রোগ হবে না। যোগীর কর্তব্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, এইভাবে আহার করা। যোগীর কর্তব্য নির্জন স্থানে বাস করা, যেখানে তাঁর যোগ অভ্যাসে কেউ কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।

শ্লোক ৪

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং যাবদর্থপরিগ্রহঃ ।
ব্রহ্মচর্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায়ঃ পুরুষার্চনম্ ॥ ৪ ॥

অহিংসা—অহিংসা; **সত্যম্**—সত্য নিষ্ঠা; **অস্তেয়ম্**—চৌর্যবৃত্তি থেকে নিরস্ত থাকা; **যাবৎ-অর্থ**—আবশ্যকতা অনুসারে; **পরিগ্রহঃ**—সংগ্রহ; **ব্রহ্মচর্যম্**—ব্রহ্মচর্য; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **শৌচম্**—শুচিতা; **স্ব-অধ্যায়ঃ**—বেদ অধ্যয়ন; **পুরুষ-অর্চনম্**—পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা।

অনুবাদ

মানুষের উচিত অহিংসা এবং সততা অনুশীলন করা, চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা এবং জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সংগ্রহ করা। তাঁর উচিত ব্রহ্মচর্য পালন করা, তপস্যা অনুষ্ঠান করা, পরিষ্কার থাকা, বেদ-অধ্যয়ন করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *পুরুষার্চনম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ রূপের। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, বা পরমেশ্বর ভগবান—*পুরুষং শাশ্বতম্*। অতএব যোগ অভ্যাস করার সময় মনকে কেবল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে একাগ্রীভূত করলেই চলবে না, উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের নিত্য আরাধনা করাও অবশ্যকর্তব্য।

ব্রহ্মচারী যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন করেন। অনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়ে যোগ অভ্যাস করা যায় না; সেইটি শঠতা। তথাকথিত যোগীরা প্রচার করে যে, যত ইচ্ছা বিষয় সুখভোগ করা সত্ত্বেও যোগী হওয়া যায়,

কিন্তু সেইটি সম্পূর্ণ বাজে কথা। এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যোগীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য পালন করা অপরিহার্য। *ব্রহ্মচর্যম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মে বা পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করা। যারা যৌন জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা কৃষ্ণভাবনার অনুকূল বিধিগুলি পালন করতে পারে না। যৌন জীবন কেবল বিবাহিতদেরই জন্য। বিবাহিত জীবনেও যিনি যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁকেও ব্রহ্মচারী বলা হয়।

যোগীর পক্ষে *অস্তেয়ম্* শব্দটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *অস্তেয়ম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'চৌর্যবৃত্তি থেকে নিরস্ত থাকা।' ব্যাপক অর্থে, যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংগ্রহ করে, সেও একটি চোর। আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ অনুসারে, ব্যক্তিগত আবশ্যকতার অধিক সংগ্রহ করা যায় না। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, কিন্তু যজ্ঞ বা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় ব্যয় করে না, সে একটি মস্ত বড় চোর।

স্বাধ্যায়ঃ মানে হচ্ছে 'প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা।' কেউ যদি কৃষ্ণভক্ত নাও হয় এবং যোগ অভ্যাস করে, তার পক্ষে জ্ঞান অর্জনের জন্য বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্তব্য। যোগ অভ্যাস করাই কেবল যথেষ্ট নয়। একজন মহান ভগবদ্ভক্ত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন যে, সমস্ত আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ তিনটি সূত্র থেকে জানা উচিত, যথা—সাধু, শাস্ত্র এবং গুরু। পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য এই তিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ-প্রদর্শক। গুরুদেব ভক্তিযোগ সম্পাদনের জন্য আদর্শ শাস্ত্রগ্রন্থ নির্দিষ্ট করে দেন, এবং তিনি স্বয়ং কেবল শাস্ত্রের ভিত্তিতে উপদেশ দেন। অতএব যোগ সাধনের জন্য আদর্শ শাস্ত্র পাঠ প্রয়োজন। প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ না করে, যোগের অনুশীলন কেবল সময়ের অপচয় মাত্র।

শ্লোক ৫

মৌনং সদাসনজয়ঃ স্থৈর্যং প্রাণজয়ঃ শনৈঃ ।
প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ান্মনসা হৃদি ॥ ৫ ॥

মৌনম্—নীরবতা; **সৎ**—ভাল; **আসন**—যোগ আসন; **জয়ঃ**—নিয়ন্ত্রণ করে; **স্থৈর্যম্**—স্থৈর্য; **প্রাণ-জয়ঃ**—প্রাণবায়ু সংযত করে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **প্রত্যাহারঃ**—প্রত্যাহার; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **বিষয়াৎ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে।

অনুবাদ

মৌন অবলম্বন করা, বিভিন্ন প্রকার যোগ আসন অভ্যাসের দ্বারা স্থৈর্য লাভ করা, প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করা, ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করা, এবং এইভাবে মনকে হৃদয়ে একাগ্র করা যোগীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

সাধারণ যোগ অভ্যাস এবং বিশেষ করে হঠযোগ মনের স্থৈর্য লাভের সাধন; সেইগুলি কখনই সিদ্ধি নয়। সর্ব প্রথমে যথাযথভাবে উপবেশন করতে সক্ষম হতে হয়, এবং তখন যোগ অভ্যাস করার জন্য মন যথেষ্টভাবে স্থির হয়। ধীরে ধীরে প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, এবং এই প্রকার নিয়ন্ত্রণের ফলে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করা যায়। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মচর্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্রিয় সংযমের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে, যৌন আবেদন সংযত করা। তাকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য। বিভিন্ন আসনের অনুশীলনের দ্বারা এবং প্রাণায়ামের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় সুখভোগ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা যায় এবং প্রত্যাহার করা যায়।

শ্লোক ৬

স্বধিষ্ণ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণধারণম্ ।
বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং সমাধানং তথাত্মনঃ ॥ ৬ ॥

স্ব-ধিষ্ণ্যানাম্—প্রাণচক্রের অভ্যন্তরে; **এক-দেশে**—এক স্থানে; **মনসা**—মন সহ; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **ধারণম্**—স্থির করে; **বৈকুণ্ঠ-লীলা**—পরমেশ্বর ভগবানের লীলায়; **অভিধ্যানম্**—ধ্যান; **সমাধানম্**—সমাধি; **তথা**—এইভাবে; **আত্মনঃ**—মনের।

অনুবাদ

প্রাণবায়ু এবং মনকে দেহাভ্যন্তরে প্রাণের ছয়টি চক্রের কোন একটিতে ধারণ করে, মনকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলায় ধ্যানস্থ করার নামই হচ্ছে সমাধি বা মনের সমাধান।

তাৎপর্য

দেহের ভিতরে প্রাণবায়ুর সঞ্চালনের ছয়টি চক্র রয়েছে। প্রথমটি উদরে, দ্বিতীয়টি হৃদয় প্রদেশে, তৃতীয়টি কণ্ঠে, চতুর্থটি তালুতে, পঞ্চমটি ভ্রূযুগলের মধ্যে, এবং সর্বোচ্চ ষষ্ঠ চক্রটি মস্তিষ্কের উপর। মন এবং প্রাণবায়ুর সঞ্চালন স্থির করে, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা স্মরণ করতে হয়। নির্বিশেষ অথবা শূন্যের ধ্যান করার কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে *বৈকুণ্ঠলীলা*। *লীলা* মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ।' পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ যদি না থাকে, তা হলে তাঁর লীলা চিন্তা করার সম্ভাবনা কোথায়? ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে, পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ কীর্তন এবং শ্রবণ করার মাধ্যমে, এই ধ্যান সম্ভব। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনুসারে প্রকট হন এবং অপ্রকট হন। বৈদিক শাস্ত্রসমূহে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, অম্বরীষ মহারাজ প্রমুখ ভক্তদের জীবনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব-সমন্বিত ভগবানের লীলা-বিলাসের বহু বর্ণনা রয়েছে। মনকে কেবল সেই সমস্ত বর্ণনায় একাগ্রচিত্তে তাঁর চিন্তায় সর্বদাই মগ্ন রাখতে হয়। তা হলেই তিনি সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হবেন। সমাধি কোন কৃত্রিম দৈহিক অবস্থা নয়; মন যখন পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে যায়, তাকেই বলা হয় সমাধি।

শ্লোক ৭

এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্মনো দুষ্টমসৎপথম্ ।
বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনকৈর্জিতপ্রাণো হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৭ ॥

এতৈঃ—এই সবের দ্বারা; **অন্যৈঃ**—অন্যের দ্বারা; **চ**—এবং; **পথিভিঃ**—উপায়ে; **মনঃ**—মন; **দুষ্টম্**—কলুষিত; **অসৎ-পথম্**—জড় সুখভোগের পথে; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **যুঞ্জীত**—নিয়ন্ত্রণ করা উচিত; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **জিত-প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু স্থির করে; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **অতন্দ্রিতঃ**—সতর্ক।

অনুবাদ

এই পন্থার দ্বারা অথবা অন্য কোন সঠিক পন্থার দ্বারা কলুষিত এবং জড় সুখভোগের প্রতি সর্বদাই আকৃষ্ট অসংযত মনকে নিয়ন্ত্রিত করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় স্থির করতে হয়।

তাৎপর্য

এতৈরন্যৈশ্চ। যোগ অনুশীলনে সাধারণত আসন, প্রাণায়াম, এবং তার পর পরমেশ্বর ভগবানের বৈকুণ্ঠলীলা চিন্তনের বিভিন্ন বিধি পালন করতে হয়। সেইটি হচ্ছে যোগ অনুশীলনের সাধারণ পন্থা। অন্যান্য নির্দেশিত পন্থার দ্বারাও মনের এই একাগ্রতা লাভ করা যায়, এবং তাই এখানে *অন্যৈশ্চ* শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে যে, জড়-জাগতিক আকর্ষণের প্রভাবে কলুষিত মনকে সংযত করে, পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্রচিত্ত করা। মনকে কখনই নির্বিশেষ অথবা শূন্যে একাগ্র করা সম্ভব নয়। সেই জন্যই তথাকথিত নির্বিশেষবাদ বা শূন্যবাদের যোগ অভ্যাসের কথা কোন প্রামাণিক যোগশাস্ত্রে নির্দেশিত হয়নি। প্রকৃত যোগী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত, কারণ তাঁর মন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণে মগ্ন। তাই কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থাই হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগ-পদ্ধতি।

শ্লোক ৮

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্ ।
তস্মিন্ স্বস্তি সমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ ॥ ৮ ॥

শুচৌ দেশে—পবিত্র স্থানে; **প্রতিষ্ঠাপ্য**—স্থাপন করে; **বিজিত-আসনঃ**—আসনের পন্থা আয়ত্ত করে; **আসনম্**—আসন; **তস্মিন্**—সেই স্থানে; **স্বস্তি সমাসীনঃ**—সহজ মুদ্রায় উপবিষ্ট হয়ে; **ঋজু-কায়ঃ**—দেহকে সোজা রেখে; **সমভ্যসেৎ**—অভ্যাস করা উচিত।

অনুবাদ

মন সংযত করে জিতাসন হয়ে, নির্জন এবং পবিত্র স্থানে আসন বিছিয়ে, সহজ মুদ্রায় উপবিষ্ট হয়ে, দেহ ঋজু রেখে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়।

তাৎপর্য

সহজ মুদ্রায় উপবেশন করাকে বলা হয় *স্বস্তি সমাসীনঃ*। যোগশাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, জঙ্ঘা এবং গোড়ালির মধ্যে পায়ের তলদেশ স্থাপন করে ঋজুভাবে উপবেশন করতে। এই মুদ্রা মনকে পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্রীভূত করতে সাহায্য করে। *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়েও এই পন্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্জন

এবং পবিত্র স্থানে উপবেশন করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণাজিন এবং কুশ ঘাসের উপর সুতিবস্ত্র বিছিয়ে সেই আসন প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৯

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ ।
প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্ ॥ ৯ ॥

প্রাণস্য—প্রাণবায়ুর; **শোধয়েৎ**—শোধন করা উচিত; **মার্গম্**—পথ; **পূর-কুম্ভক-রেচকৈঃ**—শ্বাস গ্রহণ করে, রোধ করে এবং ত্যাগ করে; **প্রতিকূলেন**—বিপরীতভাবে; **বা**—অথবা; **চিত্তম্**—মন; **যথা**—যার ফলে; **স্থিরম্**—স্থির হয়; **অচঞ্চলম্**—অচঞ্চল।

অনুবাদ

যোগীর কর্তব্য অত্যন্ত গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করা, তার পর সেই শ্বাস ধারণ করা, এবং অবশেষে শ্বাস ত্যাগ করা। অথবা, বিপরীতক্রমে, প্রথমে শ্বাস ত্যাগ করা, তার পর শ্বাস বাইরে ধারণ করা, এবং অবশেষে শ্বাস গ্রহণ করা। এইভাবে প্রাণবায়ুর পথ শোধন করতে হয়। তা করা হয় যাতে মন অচঞ্চল হয়ে স্থির হতে পারে।

তাৎপর্য

এই প্রাণায়াম অভ্যাস করা হয় মনকে সংযত করে পরমেশ্বর ভগবানে স্থির করার জন্য। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*—ভগবদ্ভক্ত অম্বরীষ মহারাজ তাঁর মনকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন রাখতেন। কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা এবং মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করা, যাতে মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন কৃষ্ণনামের চিন্ময় শব্দ-তরঙ্গে স্থির হয়। নির্দিষ্ট বিধিতে প্রাণবায়ুর পথ শোধন করার দ্বারা মনকে সংযত করার প্রকৃত উদ্দেশ্য তৎক্ষণাৎ আপনা থেকেই সাধিত হয়ে যায়, যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে মনকে স্থির করা যায়। যারা দেহাত্ম-বুদ্ধিতে অত্যন্ত মগ্ন, তাদেরই জন্য হঠযোগের পন্থা বা প্রাণায়ামের পন্থা বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে, কিন্তু যাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের সরল পন্থা অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা অনায়াসে তাঁদের মন স্থির করতে পারেন।

শ্বাস গ্রহণের পথ পরিষ্কার করার জন্য তিনটি ক্রিয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*পূরক, কুম্ভক* এবং *রেচক*। শ্বাস গ্রহণ করাকে বলা হয় *পূরক*, তা ধারণ করাকে বলা হয় *কুম্ভক* এবং অবশেষে তা ত্যাগ করাকে বলা হয় *রেচক*। বিপরীতক্রমেও এই অনুমোদিত পন্থাটি অনুষ্ঠান করা যায়। শ্বাস ত্যাগ করার পর তা কিছু কালের জন্য বাহিরে রেখে, তার পর শ্বাস গ্রহণ করা যায়। যে নাড়ির দ্বারা নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাদের বলা হয় *ইড়া* এবং *পিঙ্গলা*। *ইড়া* এবং *পিঙ্গলা* শোধন করার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে জড় সুখভোগ থেকে প্রত্যাহার করা। *ভগবদ্গীতায়* যে-কথা বলা হয়েছে—মন মানুষের শত্রু এবং বন্ধু; এই অবস্থার পরিবর্তন হয় বিভিন্নভাবে জীবের আচরণ অনুসারে। মন যখন জড় সুখভোগের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয়, তখন মন শত্রু হয়ে যায়, এবং সেই মন যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ হয়, তখন আমাদের মন আমাদের বন্ধু। যোগ-পদ্ধতিতে *পূরক, কুম্ভক* এবং *রেচকের* দ্বারা অথবা সরাসরিভাবে মনকে শ্রীকৃষ্ণের নাম অথবা রূপে যখন নিবদ্ধ করা হয়, তখন একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৮) উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাণায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য *(অভ্যাসযোগযুক্তেন)*। সংযমের এই সমস্ত পন্থার দ্বারা, মন বহির্মুখী চিন্তায় মগ্ন হতে পারে না *(চেতসা নান্যগামিনা)*। এইভাবে মনকে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানে নিবদ্ধ করার দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় *(যাতি)*।

এই যুগে যোগ-পদ্ধতির আসন এবং প্রাণায়াম অভ্যাস করা অত্যন্ত কঠিন, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*—নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করুন, কারণ কৃষ্ণনামটি পরমেশ্বর ভগবানের সব চাইতে উপযুক্ত নাম। কৃষ্ণনাম এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। তাই, কেউ যখন তাঁর মনকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ এবং কীর্তনে একাগ্রীভূত করেন, তখন তিনি একই ফল লাভ করেন।

শ্লোক ১০

মনোঽচিরাৎস্যাদ্বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ ।
বায়্বগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্ ॥ ১০ ॥

মনঃ—মন; **অচিরাৎ**—শীঘ্রই; **স্যাৎ**—হতে পারে; **বিরজম্**—উপদ্রব থেকে মুক্ত; **জিত-শ্বাসস্য**—যিনি তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া সংযত করেছেন; **যোগিনঃ**—যোগীর;

বায়ু-অগ্নিভ্যাম্—বায়ু এবং অগ্নির দ্বারা; **যথা**—ঠিক যেমন; **লোহম্**—স্বর্ণ; **ধ্মাতম্**—সন্তপ্ত; **ত্যজতি**—মুক্ত হন; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **মলম্**—কলুষ থেকে।

অনুবাদ

অগ্নি এবং বায়ুর দ্বারা সন্তপ্ত হলে, স্বর্ণ যেমন সমস্ত মল থেকে মুক্ত হয়, যোগীও তেমন প্রাণায়াম অভ্যাস করার ফলে, অচিরেই সমস্ত মানসিক উপদ্রব থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

মনকে শুদ্ধ করার এই পন্থা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও অনুমোদন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সকলের হরেকৃষ্ণ কীর্তন করা উচিত। তিনি আরও বলেছেন, পরং *বিজয়তে*—"শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের জয় হোক!" শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তনের জয়-ধ্বনি দেওয়া হয়, কারণ কীর্তন করতে শুরু করা মাত্রই মন শুদ্ধ হয়ে যায়। *চেতোদর্পণমার্জনম্*—শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তনের দ্বারা মনের সঞ্চিত সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রাণায়ামের দ্বারা অথবা সংকীর্তনের দ্বারা মনকে নির্মল করা যায়, ঠিক যেমন সোনাকে আগুনে রেখে হাঁপর দিয়ে হাওয়া দিলে, তা নির্মল হয়ে যায়।

শ্লোক ১১

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্ ।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ১১ ॥

প্রাণায়ামৈঃ—প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা; **দহেৎ**—সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায়; **দোষান্**—কলুষ; **ধারণাভিঃ**—মনকে একাগ্র করার দ্বারা; **চ**—এবং; **কিল্বিষান্**—পাপ কর্ম; **প্রত্যাহারেণ**—ইন্দ্রিয় নিরোধের দ্বারা; **সংসর্গান্**—বিষয়-সঙ্গ; **ধ্যানেন**—ধ্যানের দ্বারা; **অনীশ্বরান্ গুণান্**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ।

অনুবাদ

প্রাণায়ামের দ্বারা সমস্ত শারীরিক দোষ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়, এবং ধারণার দ্বারা সমস্ত পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায়। প্রত্যাহারের দ্বারা বিষয় সংসর্গজনিত দোষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানের দ্বারা জড় জগতের আসক্তিজনিত তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে কফ, পিত্ত এবং বায়ু শারীরিক অবস্থা পালন করে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান দেহতত্ত্বের এই বিশ্লেষণ স্বীকার করে না, কিন্তু প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পন্থা এরই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এই তিনটি উপাদানের কারণের উপর নির্ভরশীল, যে-সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* দেহের মৌলিক অবস্থা বলে বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা দেহের মৌলিক উপাদানগুলি থেকে সৃষ্ট কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মনকে একাগ্র করার দ্বারা পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করার দ্বারা জড় বিষয়ের সংসর্গ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

চরমে, প্রকৃতির তিন গুণের অতীত চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করতে হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কেউ যখন অনন্য ভক্তিতে যুক্ত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃতির তিন গুণকে অতিক্রম করেন এবং চিন্ময় ব্রহ্মরূপে নিজের পরিচিতি উপলব্ধি করেন। *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।* যোগ-পদ্ধতির প্রতিটি ক্রিয়ার সমতুল্য ক্রিয়া ভক্তিযোগে রয়েছে, কিন্তু এই যুগের জন্য ভক্তিযোগের অনুশীলন অনেক সহজ। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যা প্রবর্তন করেছেন, তা কোন নতুন পন্থা নয়। ভক্তিযোগ একটি কার্যকরী পন্থা, যার শুরু হয় শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে। ভক্তিযোগ এবং অন্যান্য যোগের চরম লক্ষ্য হচ্ছে একই পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তার মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যবহারিক এবং অন্যটি কষ্টসাধ্য। মনকে একাগ্র করার দ্বারা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে সংবরণ করার দ্বারা দৈহিক অবস্থা শুদ্ধ করতে হয়; তখনই কেবল মনকে পরমেশ্বর ভগবানে নিবদ্ধ করা যায়। তাকেই বলা হয় *সমাধি*।

শ্লোক ১২

যদা মনঃ স্বং বিরজং যোগেন সুসমাহিতম্ ।
কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎস্বনাসাগ্রাবলোকনঃ ॥ ১২ ॥

যদা—যখন; **মনঃ**—মন; **স্বম্**—নিজের; **বিরজম্**—শুদ্ধ; **যোগেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **সু-সমাহিতম্**—সুসংযত; **কাষ্ঠাম্**—অংশ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **স্ব-নাসা-অগ্র**—স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে; **অবলোকনঃ**—দৃষ্টিপাত করে।

অনুবাদ

যোগ অভ্যাসের দ্বারা মন যখন সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তখন অর্ধ নিমীলিত নেত্রে স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত করে, পরমেশ্বর ভগবানের রূপের ধ্যান করতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীবিষ্ণুর অংশের ধ্যান করতে হয়। *কাষ্ঠাম্* শব্দটি বিষ্ণুর অংশের অংশ পরমাত্মাকে সূচিত করছে। *ভগবতঃ* শব্দটি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে ইঙ্গিত করছে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ; তাঁর প্রথম প্রকাশ হচ্ছেন বলদেব, এবং বলদেব থেকে সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ আদি বহু রূপের প্রকাশ হয়, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন পুরুষাবতারগণ। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে *পুরুষার্চনম্* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, এই পুরুষ হচ্ছেন পরমাত্মা। যোগীর ধেয় পরমাত্মার বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে দেওয়া হয়েছে। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং ভগবানের কলা বা বিষ্ণুর অংশ পরমাত্মায় মনকে একাগ্র করে ধ্যান করতে হয়।

শ্লোক ১৩

প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্ ।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৩ ॥

প্রসন্ন—প্রফুল্ল; **বদন**—মুখমণ্ডল; **অম্ভোজম্**—পদ্ম-সদৃশ; **পদ্মগর্ভ**—পদ্মের অভ্যন্তর ভাগ; **অরুণ**—রক্তিম; **ঈক্ষণম্**—চক্ষু; **নীল-উৎপল**—নীল-কমল; **দল**—পাপড়ি; **শ্যামম্**—শ্যামবর্ণ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—গদা; **ধরম্**—ধারণ করে রয়েছেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন, নয়ন পদ্মগর্ভের মতো অরুণ বর্ণ, অঙ্গ নীল উৎপল দলের মতো শ্যাম বর্ণ। তাঁর তিন হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, এবং গদা ধারণ করে রয়েছেন।

তাৎপর্য

এখানে নিশ্চিতরূপে বিষ্ণুরূপের ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুর বারটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ রয়েছে, যা *শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। শূন্য বা নিরাকারের ধ্যান কখনও করা যায় না; মনকে ভগবানের সবিশেষ রূপে একাগ্র করতে হয়, যাঁর মুখমণ্ডল এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে সুপ্রসন্ন। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিরাকার অথবা শূন্যের ধ্যান করা অত্যন্ত কষ্টকর। যারা নিরাকার বা শূন্যের ধ্যানের প্রতি আসক্ত, তাদের নানা রকম কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে, কেননা আমাদের মন কখনও আকার-বিহীন কোন কিছুতে একাগ্র হতে অভ্যস্ত নয়। প্রকৃত পক্ষে এই প্রকার ধ্যান কখনও সম্ভব নয়। *ভগবদ্গীতায়ও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মনকে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে একাগ্র করতে হয়।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির বর্ণনা করে এখানে বলা হয়েছে *নীলোৎপলদল*, অর্থাৎ তা নীল পদ্মের পাপড়ির মতো। অনেকে প্রায়ই প্রশ্ন করে, কৃষ্ণের রঙ নীল কেন? ভগবানের গায়ের রঙ কোন শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত নয়। প্রামাণিক শাস্ত্রে তা বর্ণনা করা হয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়ও* শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রঙ বর্ষার জলভরা মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবানের অঙ্গকান্তি কোন কবির কল্পনা নয়। *ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, পুরাণ* আদি সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রে ভগবানের দেহের বর্ণনা, তাঁর অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সামগ্রীর সমস্ত বর্ণনা রয়েছে। এখানে ভগবানের রূপ *পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর নেত্র পদ্মগর্ভের মতো অরুণ বর্ণ, এবং তাঁর চার হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম।

শ্লোক ১৪

লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীতকৌশেয়বাসসম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্ ॥ ১৪ ॥

লসৎ—উজ্জ্বল; **পঙ্কজ**—পদ্মফুলের; **কিঞ্জল্ক**—কেশর; **পীত**—হলুদ; **কৌশেয়**—পট্টবস্ত্র; **বাসসম্**—তাঁর বসন; **শ্রীবৎস**—শ্রীবৎস চিহ্ন-সমন্বিত; **বক্ষসম্**—বক্ষস্থল; **ভ্রাজৎ**—অতি উজ্জ্বল; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণি; **আমুক্ত**—বিরাজিত; **কন্ধরম্**—তাঁর গলদেশ।

অনুবাদ

তাঁর কটিদেশ পদ্ম-কেশরের মতো পীত উজ্জ্বল পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। তাঁর কণ্ঠে দীপ্তিশালী কৌস্তুভ মণি বিরাজিত।

তাৎপর্য

ভগবানের বসনের বর্ণ পদ্মফুলের পরাগের মতো কেশর-হলুদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর বক্ষে দোদুল্যমান কৌস্তুভ মণিরও বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর কণ্ঠ সুন্দর মণিরত্নে বিভূষিত। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, যার একটি হচ্ছে ঐশ্বর্য। তিনি বহু মূল্যবান মণিরত্নে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত, যা এই জড় জগতে কোথাও দেখা যায় না।

শ্লোক ১৫

মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া ।
পরার্ধ্যহারবলয়কিরীটাঙ্গদনূপুরম্ ॥ ১৫ ॥

মত্ত—প্রমত্ত; **দ্বি-রেফ**—ভ্রমরকুলের; **কলয়া**—গুঞ্জন; **পরীতম্**—পরিহিত; **বন-মালয়া**—বনফুলের মালার দ্বারা; **পরার্ধ্য**—অমূল্য; **হার**—মুক্তামালা; **বলয়**—কঙ্কন; **কিরীট**—মুকুট; **অঙ্গদ**—অঙ্গদ; **নূপুরম্**—নূপুর।

অনুবাদ

তাঁর গলদেশে বনমালা বিলম্বিত রয়েছে, এবং মধুর গন্ধে মত্ত ভ্রমরেরা মালার চারিপাশে গুঞ্জন করছে। তিনি বহু মূল্য মুক্তাহার, কিরীট, অঙ্গদ এবং নূপুরের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, ভগবানের গলদেশে বিলম্বিত ফুলমালাটি একেবারে তাজা। প্রকৃত পক্ষে বৈকুণ্ঠলোকে বা চিদাকাশে সব কিছুই একেবারে তাজা। এমন কি গাছ থেকে তোলার পরও ফুলগুলি তাজা থাকে, কারণ চিদাকাশে সব কিছুই তাদের মৌলিকতা বজায় রাখে এবং কখনই শুকিয়ে যায় না। গাছ থেকে তোলা ফুলগুলি দিয়ে মালা বানানোর পর, তাদের সৌরভ ম্লান হয়ে যায় না, কারণ সেই সমস্ত বৃক্ষ এবং ফুল উভয়ই চিন্ময়। গাছ থেকে আহরণ করার পর ফুলগুলি

ঠিক তেমনই থাকে; তাদের গন্ধ ম্লান হয়ে যায় না। সেই ফুলগুলি গলার মালাতেই থাকুক অথবা গাছেই থাকুক, ভ্রমরেরা তাদের প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট হয়। চিদাকাশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সেখানে সব কিছুই নিত্য এবং অব্যয়। সেখানে সব কিছু থেকে সব কিছু নিয়ে নেওয়া হলেও সব কিছুই পূর্ণ থাকে, অথবা সাধারণত যে-রকম বলা হয়ে থাকে, চিৎ-জগতে এক থেকে এক নিয়ে নিলে একই থাকে, এবং একের সঙ্গে এক যোগ করলেও তা একই হয়। ভ্রমরেরা তাজা ফুলের চারপাশে গুঞ্জন করে, এবং তাদের মধুর গুঞ্জনধ্বনি ভগবান উপভোগ করেন। ভগবানের বলয়, কণ্ঠহার, মুকুট এবং নূপুর সবই অমূল্য মণিরত্ন শোভিত। যেহেতু সেই সমস্ত মণিরত্ন চিন্ময়, তাই তাদের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৬

কাঞ্চীগুণোল্লসচ্ছ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্ ।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্ধনম্ ॥ ১৬ ॥

কাঞ্চী—কোমরবন্ধ; **গুণ**—গুণ; **উল্লসৎ**—উজ্জ্বল; **শ্রোণিম্**—তাঁর কটিদেশ; **হৃদয়**—হৃদয়; **অম্ভোজ**—পদ্ম; **বিষ্টরম্**—যাঁর আসন; **দর্শনীয়-তমম্**—সব চাইতে সুন্দর-দর্শন; **শান্তম্**—প্রশান্ত; **মনঃ**—মন, হৃদয়; **নয়ন**—নেত্র; **বর্ধনম্**—আনন্দ-বর্ধক।

অনুবাদ

তাঁর কটিদেশে কাঞ্চিদাম, তিনি তাঁর ভক্তের হৃদয়-কমলে দণ্ডায়মান। তাঁর মতো সুন্দর দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই, এবং তাঁর প্রশান্ত বিগ্রহ তাঁর ভক্ত-দর্শকের মন এবং নয়নের আনন্দ বর্ধন করে।

তাৎপর্য

এখানে ব্যবহৃত *দর্শনীয়তমম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবান এত সুন্দর যে, ভক্ত-যোগী আর অন্য কিছু দর্শন করতে ইচ্ছা করেন না। সুন্দর বস্তু দর্শন করার সমস্ত বাসনা ভগবানকে দর্শন করার ফলে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে যায়। জড় জগতে আমরা সুন্দর বস্তু দর্শন করতে চাই, কিন্তু সেই বাসনা কখনই তৃপ্ত হয় না। জড় কলুষের ফলে আমাদের সমস্ত জড়-জাগতিক প্রবণতাগুলি সর্বদাই অতৃপ্ত থাকে। কিন্তু আমাদের দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ইত্যাদির বাসনাগুলি যখন পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন সেইগুলি সর্বোচ্চ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

পরমেশ্বর ভগবান যদিও তাঁর নিত্য স্বরূপে এত সুন্দর এবং ভক্তের হৃদয়ের আনন্দ বর্ধনকারী, তবুও তাঁর সেই রূপ নির্বিশেষবাদীদের আকৃষ্ট করে না, যারা কেবল তাঁর নির্বিশেষ রূপের ধ্যান করতে চায়। নির্বিশেষবাদীদের এই ধ্যান কেবল নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র। প্রকৃত যোগী অর্ধনিমীলিত নেত্রে পরমেশ্বর ভগবানের রূপের ধ্যান করেন, তিনি কোন শূন্য বা নিরাকারের ধ্যান করেন না।

শ্লোক ১৭

অপীচ্যদর্শনং শশ্বৎসর্বলোকনমস্কৃতম্ ।
সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্ ॥ ১৭ ॥

অপীচ্য-দর্শনম্—অত্যন্ত সুন্দর-দর্শন; **শশ্বৎ**—নিত্য; **সর্বলোক**—সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা; **নমঃ-কৃতম্**—পূজনীয়; **সন্তম্**—অবস্থিত; **বয়সি**—যুবাবস্থায়; **কৈশোরে**—কৈশোরে; **ভৃত্য**—তাঁর ভক্তদের উপর; **অনুগ্রহ**—আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য; **কাতরম্**—উৎসুক।

অনুবাদ

ভগবান অত্যন্ত সুন্দর-দর্শন, এবং তিনি সর্বলোকের আরাধ্য। তিনি নিত্য নবকিশোর এবং সর্বদাই তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপা বিতরণে উৎসুক।

তাৎপর্য

সর্বলোকনমস্কৃতম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি প্রতিটি গ্রহলোকের প্রতিটি ব্যক্তির পূজনীয়। এই জড় জগতে এবং চিৎ-জগতে অসংখ্য গ্রহলোক রয়েছে। প্রতিটি লোকে সেখানকার অসংখ্য অধিবাসীরা ভগবানের আরাধনা করেন, কেননা ভগবান হচ্ছেন সকলেরই আরাধ্য। নির্বিশেষবাদীরাই কেবল তাঁর আরাধনা করে না। পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত সুন্দর। এখানে *শশ্বৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এমন নয় যে, তিনি কেবল তাঁর ভক্তদের কাছেই সুন্দর বলে প্রতিভাত হন কিন্তু চরমে তিনি নিরাকার। *শশ্বৎ* মানে হচ্ছে 'সর্বদাই বিরাজমান।' তাঁর সেই সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী নয়। তা চিরস্থায়ী—তিনি নিত্য নবকিশোর। *ব্রহ্মসংহিতায়ও* (৫/৩৩) উল্লেখ করা হয়েছে—*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ*। আদি পুরুষ অদ্বিতীয়, তবুও তাঁকে কখনই বৃদ্ধ বলে মনে হয় না; তিনি সর্বদাই প্রফুল্ল নবযৌবন-সম্পন্ন।

ভগবানের মুখমণ্ডল সর্বদাই ব্যক্ত করে যে, তিনি তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করতে এবং আশীর্বাদ প্রদান করতে উৎসুক; কিন্তু যারা অভক্ত তাদের প্রতি তিনি নীরব। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী, যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং যেহেতু সমস্ত জীব তাঁর সন্তান, কিন্তু তবুও তাঁর সেবায় যুক্ত ভক্তদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত। সেই তত্ত্ব এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে—তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করতে উৎসুক। ভক্তেরা যেমন সর্বদাই ভগবানের সেবা করার জন্য উৎসুক, ভগবানও তেমন তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের উপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করতে উৎসুক।

শ্লোক ১৮

কীর্তন্যতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্ ।
ধ্যায়েদ্দেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ ॥ ১৮ ॥

কীর্তন্য—কীর্তনযোগ্য; **তীর্থ-যশসম্**—ভগবানের মহিমা; **পুণ্য-শ্লোক**—ভক্তের; **যশঃ-করম্**—যশ বর্ধনকারী; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **দেবম্**—ভগবানের; **সমগ্র-অঙ্গম্**—সমস্ত অঙ্গ; **যাবৎ**—যে পর্যন্ত; **ন**—না; **চ্যবতে**—বিচলিত হয়; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

ভগবানের মহিমা সর্বদাই কীর্তন করার যোগ্য, কারণ তাঁর মহিমা তাঁর ভক্তদের মহিমা বর্ধন করে। তাই ভগবান এবং তাঁর ভক্তের ধ্যান করা উচিত। মন যতক্ষণ না স্থির হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শাশ্বত রূপের ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

মনকে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে স্থির করা উচিত। কেউ যখন ভগবানের কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম, নারায়ণ আদি অনন্ত রূপের কোন একটির ধ্যানে অভ্যস্ত হন, তখন তিনি যোগের সিদ্ধি লাভ করেন। সেইকথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম লাভ করেছেন, এবং যাঁর চক্ষুদ্বয় প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে, তিনি নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। ভগবদ্ভক্ত বিশেষ করে ভগবানের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করেন। সেইটি হচ্ছে যোগের সিদ্ধি। যোগ অনুশীলন ততক্ষণ পর্যন্ত করা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত

মন আর পলকের জন্যও বিচলিত না হয়। *ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*—শ্রীবিষ্ণুর রূপ হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ রূপ এবং ঋষিগণ ও মহাত্মাগণ সর্বদাই সেই রূপ দর্শন করেন।

ভগবদ্ভক্তেরা যখন ভগবানের মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন, তখনও সেই একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। মন্দিরে ভগবানের সেবা এবং ধ্যানের দ্বারা ভগবানের রূপ দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা ভগবানের রূপ মনে প্রকাশিত হোক অথবা কোন বস্তুতে প্রকাশিত হোক, তা একই। ভক্তের দর্শনের জন্য আট প্রকার রূপ অনুমোদিত হয়েছে। সেইগুলি হচ্ছে—মাটি, কাঠ, শিলা, ধাতু, চিত্রপট, বালুকা, মণি এবং মন। এই আটটি উপাদান থেকে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হন এবং সেই সব কটি রূপেরই সমান মহিমা। এমন নয় যে, যিনি মনের মধ্যে ভগবানের রূপের ধ্যান করছেন, তা মন্দিরে পূজিত রূপ থেকে ভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান পরমতত্ত্ব, এবং তাই তাঁর বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নির্বিশেষবাদীরা, যারা ভগবানের শাশ্বত রূপের অবমাননা করে, তারা কোন গোলাকার (শূন্য) রূপের কল্পনা করে। তারা বিশেষভাবে ওঁকারের প্রতি আসক্ত; কিন্তু এই ওঁকারেরও রূপ রয়েছে। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওঁকার হচ্ছে শব্দরূপে ভগবানের প্রকাশ। তেমনই, মূর্তিরূপে এবং চিত্ররূপেও ভগবানের প্রকাশ রয়েছে।

এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *পুণ্যশ্লোকযশস্করম্*। ভগবদ্ভক্তকে বলা হয় *পুণ্যশ্লোক*। ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের প্রভাবে যেমন শুদ্ধ হওয়া যায়, তেমনই ভগবানের পবিত্র ভক্তের নাম কীর্তনের প্রভাবেও শুদ্ধ হওয়া যায়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন। কখনও কখনও ভক্তের শুদ্ধ নাম কীর্তন করা কার্যকর। এইটি একটি অত্যন্ত পবিত্র পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক সময় গোপিকাদের পবিত্র নাম কীর্তন করছিলেন, এবং তখন তাঁর কিছু ছাত্র তাঁর সমালোচনা করেছিলেন—"আপনি কেন গোপীদের নাম কীর্তন করছেন? কেন কৃষ্ণের নাম কীর্তন করছেন না?" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সমালোচনায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন, এবং এইভাবে তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। তিনি তখন কীর্তনের চিন্ময় পন্থা সম্বন্ধে তাঁকে উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতার জন্য তাদের তিরস্কার করতে চেয়েছিলেন।

ভগবানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাঁর যে-সমস্ত ভক্ত তাঁর কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাঁরাও মহিমান্বিত হন। অর্জুন, প্রহ্লাদ, মহারাজ জনক, বলি মহারাজ প্রমুখ বহু ভক্ত সন্ন্যাস আশ্রমও গ্রহণ করেননি, তাঁরা ছিলেন গৃহস্থ। তাঁদের মধ্যে

অনেকে, যেমন—প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজ অসুরকুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা ছিলেন একজন দৈত্য এবং বলি মহারাজ ছিলেন প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে তাঁরা যশস্বী হয়েছেন। যাঁরাই ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কিত, তাঁরাই ভগবানের সঙ্গে যশস্বী হয়েছেন। এখানে সিদ্ধান্তটি হচ্ছে এই যে, সিদ্ধ যোগীর কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবানের রূপ দর্শনে অভ্যস্ত হওয়া, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মন এইভাবে স্থির হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর যোগ অনুশীলন করে যাওয়া উচিত।

শ্লোক ১৯

স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্ ।
প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধভাবেন চেতসা ॥ ১৯ ॥

স্থিতম্—দণ্ডায়মান; **ব্রজন্তম্**—গমনশীল; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **শয়ানম্**—শায়িত; **বা**—অথবা; **গুহা-আশয়ম্**—হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান; **প্রেক্ষণীয়**—সুন্দর; **ঈহিতম্**—লীলাসমূহ; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **শুদ্ধ-ভাবেন**—শুদ্ধ; **চেতসা**—মনের দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর মগ্ন হয়ে, যোগী তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে দণ্ডায়মান, গমনশীল, উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় দর্শন করেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ সর্বদাই অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয়।

তাৎপর্য

অন্তরে ভগবানের রূপের ধ্যান করার পন্থা এবং ভগবানের মহিমা ও লীলা-বিলাসের কীর্তন করার পন্থা একই। তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, ভগবানের কথা শ্রবণ এবং ভগবানের লীলায় মনকে স্থির করার পন্থা অন্তরে ধ্যানের পন্থা থেকে অনেক সহজ, কারণ ভগবানের কথা চিন্তা করতে শুরু করা মাত্রই, বিশেষ করে এই যুগে, মন বিচলিত হয়ে ওঠে, এবং এত বিক্ষোভের জন্য মনে ভগবানকে দর্শন করার পন্থা ব্যাহত হয়। কিন্তু যখন ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের মহিমা কীর্তন করে শব্দ উচ্চারিত হয়, তখন মানুষ তা শুনতে বাধ্য হয়। এই শ্রবণের ক্রিয়া মনের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং যোগ অভ্যাস আপনা থেকেই অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। যেমন একটি শিশুও *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত গাভী এবং সখাগণ সহ

ভগবানের গোচারণে যাওয়ার বর্ণনা শ্রবণ অথবা পাঠ করার মাধ্যমেই কেবল ভগবানের লীলা ধ্যান করার ফল লাভ করতে পারে। শ্রবণের মধ্যে মনোনিবেশ নিহিত রয়েছে। এই কলিযুগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যেন নিরন্তর *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ এবং কীর্তন করেন। তিনি আরও বলেছেন যে, মহাত্মারা যেন সর্বদাই ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, এবং তা শ্রবণ করার ফলে অন্যেরা সমভাবে লাভবান হতে পারবে। যোগ-পদ্ধতিতে ভগবানের দণ্ডায়মান, গমনশীল, শায়িত ইত্যাদি যে-কোন রূপের দিব্য লীলা-বিলাসের ধ্যান আবশ্যক।

শ্লোক ২০

তস্মিঁল্লব্ধপদং চিত্তং সর্বাবয়বসংস্থিতম্ ।
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুজ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ ॥ ২০ ॥

তস্মিন্—ভগবানের রূপে; **লব্ধ-পদম্**—স্থির; **চিত্তম্**—মন; **সর্ব**—সমস্ত; **অবয়ব**—অঙ্গ; **সংস্থিতম্**—স্থিরীকৃত; **বিলক্ষ্য**—বিশেষভাবে এক স্থানে; **সংযুজ্যাৎ**—মনকে যুক্ত করা উচিত; **অঙ্গে**—প্রতিটি অঙ্গে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **মুনিঃ**—যোগী।

অনুবাদ

তাঁর মনকে ভগবানের শাশ্বত রূপে নিবদ্ধ করে, যোগী ভগবানের পূর্ণ অবয়বের সম্যক্ দর্শন না করে, এক-একটি অঙ্গে মনকে স্থির করবেন।

তাৎপর্য

এখানে *মুনি* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *মুনি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি চিন্তা, অনুভব এবং ইচ্ছা করতে অত্যন্ত পারদর্শী। এখানে তাঁকে ভক্ত বা যোগী বলে উল্লেখ করা হয়নি। যাঁরা ভগবানের রূপের ধ্যান করার চেষ্টা করেন, তাঁদের বলা হয় মুনি, বা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্তু যাঁরা ভগবানের বাস্তবিক সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় ভক্তিযোগী। যে চিন্তার পন্থা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে, তা মুনিদের শিক্ষার জন্য। ভগবান যে কখনই নিরাকার নন, যোগীদের এই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে ভগবানের সবিশেষ রূপের এক-একটি অঙ্গ দর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবানকে সমগ্ররূপে চিন্তা কখনও কখনও নির্বিশেষ হতে পারে; তাই, এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রথমে যেন ভগবানের চরণ-কমলের

ধ্যান করা হয়, তার পর তাঁর পায়ের, তার পর জঙ্ঘার, তার পর কোমর, তার পর বক্ষ, তার পর কণ্ঠ, তার পর মুখমণ্ডল ইত্যাদি। ভগবানের চরণ-কমল থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ভগবানের উপরের অঙ্গে মনোনিবেশ করতে হয়।

শ্লোক ২১

সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং
বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোরুহলাঞ্ছনাঢ্যম্ ।
উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখচক্রবাল-
জ্যোৎস্নাভিরাহতমহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্ ॥ ২১ ॥

সঞ্চিন্তয়েৎ—মনকে একাগ্র করা উচিত; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **চরণ-অরবিন্দম্**—চরণ-কমলে; **বজ্র**—বজ্র; **অঙ্কুশ**—অঙ্কুশ; **ধ্বজ**—পতাকা; **সরোরুহ**—পদ্ম; **লাঞ্ছন**—চিহ্ন; **আঢ্যম্**—অলঙ্কৃত; **উত্তুঙ্গ**—উন্নত; **রক্ত**—লাল; **বিলসৎ**—উজ্জ্বল; **নখ**—নখ; **চক্রবাল**—চন্দ্রমণ্ডল; **জ্যোৎস্নাভিঃ**—কিরণচ্ছটা; **আহত**—দূরীভূত; **মহৎ**—ঘন; **হৃদয়**—হৃদয়ের; **অন্ধকারম্**—অন্ধকার।

অনুবাদ

ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ এবং পদ্ম চিহ্নিত ভগবানের চরণ-কমলের ধ্যান করা। সেই চরণ-কমলের অত্যন্ত সুন্দর রক্তবর্ণে শোভমান নখরূপ চন্দ্রমণ্ডলের কিরণচ্ছটায় হৃদয়ের ঘন অন্ধকার দূরীভূত হয়।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা বলে যে, পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপে যেহেতু মানুষ তার মনকে স্থির করতে অক্ষম, তাই সে যে-কোন একটি রূপের কল্পনা করে, সেই কল্পিত রূপের ধ্যান করতে পারে। কিন্তু সেই প্রকার পন্থা এখানে অনুমোদিত হয়নি। কল্পনা সর্বদাই কল্পনা, এবং তার ফল কেবল কল্পনাতেই পর্যবসিত হয়।

এখানে ভগবানের শাশ্বত রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের চরণতল বজ্র, ধ্বজা, পদ্ম এবং অঙ্কুশ রেখার দ্বারা চিহ্নিত। তাঁর নখরাজির কিরণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল। কোন যোগী যদি ভগবানের চরণতলের চিহ্নগুলি দর্শন করেন, এবং তাঁর নখের উজ্জ্বল আলো দর্শন করেন, তা হলে তিনি তাঁর জড় অস্তিত্বের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে পারেন। মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার

দ্বারা এই প্রকার মুক্তি লাভ করা যায় না, পক্ষান্তরে ভগবানের উজ্জ্বল পদনখ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা দর্শন করে, সে মুক্তি লাভ করতে পারে। অর্থাৎ কেউ যদি জড় অস্তিত্বের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মন স্থির করতে হবে।

শ্লোক ২২

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥ ২২ ॥

যৎ—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **শৌচ**—প্রক্ষালিত; **নিঃসৃত**—বহির্গত; **সরিৎ-প্রবর**—গঙ্গার; **উদকেন**—জলের দ্বারা; **তীর্থেন**—পবিত্র; **মূর্ধ্নি**—তাঁর মস্তকে; **অধিকৃতেন**—ধারণ করে; **শিবঃ**—শিব; **শিবঃ**—মঙ্গলময়; **অভূৎ**—হয়েছেন; **ধ্যাতুঃ**—ধ্যানকারীর; **মনঃ**—মনে; **শমল-শৈল**—পাপের পাহাড়; **নিসৃষ্ট**—প্রক্ষিপ্ত; **বজ্রম্**—বজ্র; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **চিরম্**—দীর্ঘ কাল; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **চরণ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্মের।

অনুবাদ

ভগবানের চরণ-কমল প্রক্ষালিত জল থেকে উৎপন্ন গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করে, শিবও মঙ্গলময় হয়েছেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষিপ্ত বজ্রের মতো, যা ধ্যানকারীর মনে সঞ্চিত পর্বত-সদৃশ পাপসমূহ ধ্বংস করে; অতএব দীর্ঘ কাল যাবৎ ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দেবাদিদেব মহাদেবের অবস্থান বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। নির্বিশেষবাদীরা পরামর্শ দেয় যে, পরমব্রহ্মের কোন রূপ নেই, এবং তাই বিষ্ণু অথবা শিব অথবা দুর্গাদেবী কিংবা তাঁদের পুত্র গণেশের রূপ সমভাবে কল্পনা করা যেতে পারে, কেননা সেইগুলি সবই সমান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সকলের পরম প্রভু। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (আদি ৫/১৪২) বলা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*—শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান,

এবং শিব, ব্রহ্মা আদি অন্য সকলেই তাঁর ভৃত্য, অন্যান্য দেবতাদের আর কি কথা। সেই একই তত্ত্ব এখানে বর্ণিত হয়েছে। শিব এই জন্যই মহিমান্বিত যে, তিনি তাঁর মস্তকে পবিত্র গঙ্গাকে ধারণ করেছেন, যার উদ্ভব হয়েছে ভগবান বিষ্ণুর চরণ প্রক্ষালন নিঃসৃত জল থেকে। *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানকে যারা শিব ব্রহ্মা আদি দেবতাদের সম স্তরে স্থাপন করে, তারা তৎক্ষণাৎ পাষণ্ডী বা নাস্তিক হয়ে যায়। কখনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং দেবতাদের সমান বলে করা উচিত নয়।

এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব হচ্ছে যে, অনাদিকাল ধরে জড়া প্রকৃতির সংসর্গে থাকার ফলে, বদ্ধ জীবের মন প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার বাসনারূপ স্তূপীকৃত ময়লায় পূর্ণ। এই মল পর্বত প্রমাণ। কিন্তু পর্বত যেমন বজ্রাঘাতে ধ্বংস হয়, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে, যোগীর মনের পর্বত-প্রমাণ মল সেইভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়। যোগী যদি তাঁর মনের পর্বত-প্রমাণ মল ধ্বংস করতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে হবে, শূন্য অথবা নিরাকারের কল্পনা করলে কোন কাজ হবে না। যেহেতু এই মল কঠিন পর্বতের মতো সঞ্চিত হয়েছে, তাই দীর্ঘ কাল যাবৎ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে হবে। কিন্তু যিনি নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করতে অভ্যস্ত, তাঁর কথা আলাদা। ভগবানের ভক্তেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এমনভাবেই স্থির থাকেন যে, তাঁরা আর অন্য কোন কিছুর চিন্তা করেন না। যাঁরা যোগ-পদ্ধতির অভ্যাস করেন, তাঁদের উচিত বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করে, ইন্দ্রিয় সংযত করে, দীর্ঘ কাল ধরে ভগবানের চরণ-কমলের ধ্যান করা।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *ভগবতশ্চরণারবিন্দম্*—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মনকে নিবদ্ধ করতে হয়। মায়াবাদীরা কল্পনা করে যে, মুক্তি লাভের জন্য শিব অথবা ব্রহ্মা অথবা দুর্গাদেবীর শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ঠিক নয়। বিশেষভাবে *ভগবতঃ* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। *ভগবতঃ* মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর,' অন্য কারও নয়। এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি হচ্ছে *শিবঃ শিবোঽভূৎ*। শিব তাঁর স্বরূপে সর্বদাই মহান এবং মঙ্গলময়, কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর মস্তকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূতা গঙ্গাকে ধারণ করেছেন, তাই তিনি আরও মঙ্গলময় এবং মহত্ত্বপূর্ণ হয়েছেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে, শিবেরও মহিমা বর্ধিত হয়, অতএব সাধারণ জীবের আর কি কথা।

শ্লোক ২৩

জানুদ্বয়ং জলজলোচনয়া জনন্যা
লক্ষ্ম্যাখিলস্য সুরবন্দিতয়া বিধাতুঃ ।
উর্বোর্নিধায় করপল্লবরোচিষা যৎ
সংলালিতং হৃদি বিভোরভবস্য কুর্যাৎ ॥ ২৩ ॥

জানু-দ্বয়ম্—জানুদ্বয়; **জলজ-লোচনয়া**—কমল-নয়ন; **জনন্যা**—জননী; **লক্ষ্ম্যা**—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা; **অখিলস্য**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **সুর-বন্দিতয়া**—দেবতাদের দ্বারা পূজিত; **বিধাতুঃ**—ব্রহ্মার; **উর্বোঃ**—উরুতে; **নিধায়**—স্থাপন করে; **কর-পল্লব-রোচিষা**—সুন্দর করপল্লবের দ্বারা; **যৎ**—যা; **সংলালিতম্**—স্পর্শের দ্বারা সেবিত; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিভোঃ**—ভগবানের; **অভবস্য**—সংসারের অতীত; **কুর্যাৎ**—ধ্যান করা উচিত।

অনুবাদ

যোগীদের কর্তব্য সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর কার্যকলাপ হৃদয়ে ধ্যান করা, যিনি সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পূজিতা এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জননী। তিনি সর্বদা সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের পা এবং জঙ্ঘা তাঁর করপল্লবের দ্বারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেবা করে থাকেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিরূপে নিযুক্ত হয়েছেন। যেহেতু গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন তাঁর পিতা, তাই লক্ষ্মীদেবী স্বাভাবিকভাবে তাঁর মাতা। সমস্ত দেবতারা এবং অন্যান্য লোকের সমস্ত অধিবাসীরা লক্ষ্মীদেবীর পূজা করেন। মানুষেরাও লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভের জন্য অত্যন্ত উৎসুক। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী সর্বদাই ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভ-সমুদ্রে শায়িত পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের পদসেবায় ব্যস্ত। ব্রহ্মাকে এখানে লক্ষ্মীদেবীর পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি লক্ষ্মীদেবীর গর্ভজাত নন। ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে স্বয়ং ভগবানের নাভি থেকে। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি পদ্ম উদ্ভূত হয়, এবং তা থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তাই লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক ভগবানের পদসেবা কোন সাধারণ পত্নীর আচরণ বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবান সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের আচরণের অতীত। এখানে অভবস্য শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, তিনি লক্ষ্মীদেবীর সহায়তা ব্যতীতই ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করতে পারেন।

যেহেতু চিন্ময় আচরণ জড়-জাগতিক আচরণ থেকে ভিন্ন, তাই কখনও মনে করা উচিত নয় যে, দেবতা অথবা মানুষেরা যে-ভাবে তাঁদের পত্নীর সেবা গ্রহণ করে থাকেন, ভগবানও সেইভাবে তাঁর পত্নীর সেবা গ্রহণ করেন। এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যোগীরা যেন নিরন্তর সেই চিত্রটি তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেন। ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই লক্ষ্মী এবং নারায়ণের এই সম্পর্কের কথা চিন্তা করেন; তাই তাঁরা নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদীদের মতো মনোধর্মী ধ্যান করেন না।

ভব শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি একটি জড় শরীর ধারণ করেছেন,' এবং অভব শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি কোন জড় শরীর ধারণ করেন না, পক্ষান্তরে তাঁর আদি চিন্ময় শরীরে অবতরণ করেন।' ভগবান নারায়ণ কোন জড় বস্তু থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি। জড়ের উদ্ভব হয় জড় থেকে, কিন্তু তাঁর জন্ম জড় পদার্থ থেকে হয়নি। ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে জড় জগৎ সৃষ্টির পর, কিন্তু ভগবান যেহেতু সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, তাই ভগবানের কোন জড় শরীর নেই।

শ্লোক ২৪

উরূ সুপর্ণভুজয়োরধিশোভমানা-
বোজোনিধী অতসিকাকুসুমাবভাসৌ ।
ব্যালম্বিপীতবরবাসসি বর্তমান-
কাঞ্চীকলাপপরিরম্ভি নিতম্ববিম্বম্ ॥ ২৪ ॥

উরূ—ঊরুদ্বয়; **সুপর্ণ**—গরুড়ের; **ভুজয়োঃ**—স্কন্ধদ্বয়; **অধি**—উপরে; **শোভমানৌ**—সুন্দর; **ওজঃ-নিধী**—সমস্ত শক্তির আধার; **অতসিকা-কুসুম**—অতসী ফুলের; **অবভাসৌ**—কান্তির মতো; **ব্যালম্বি**—লম্বমান; **পীত**—পীত; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **বাসসি**—বস্ত্রের উপর; **বর্তমান**—বিরাজমান; **কাঞ্চী-কলাপ**—কোমরবন্ধের দ্বারা; **পরিরম্ভি**—বেষ্টিত; **নিতম্ব-বিম্বম্**—তাঁর সুডোল নিতম্ব।

অনুবাদ

তার পর যোগী পরমেশ্বর ভগবানের ঊরুদ্বয়ের ধ্যান করবেন, যা সমস্ত শক্তির আধার। তাঁর ঊরুদ্বয় অতসী পুষ্পের মতো শুভ্র-শ্যামল, এবং ভগবান যখন গরুড়ের স্কন্ধে বাহিত হন, তখন তা সব চাইতে সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়। তার পর যোগী গুল্ফদেশ পর্যন্ত লম্বিত পীত বসনোপরি কাঞ্চিদাম-বেষ্টিত ভগবানের সুডোল নিতম্বদেশের ধ্যান করবেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত শক্তির উৎস, এবং তাঁর শক্তি তাঁর চিন্ময় শরীরের জঙ্ঘায় অবস্থিত। তাঁর সমস্ত শরীর সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ—সমগ্র সম্পদ, সমগ্র বল, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য। যোগীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের চরণতল থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে জানু, উরু থেকে ক্রমে ক্রমে অবশেষে তাঁর মুখমণ্ডল পর্যন্ত তাঁর দিব্য রূপের ধ্যান করার জন্য। পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান শুরু হয় তাঁর চরণ থেকে।

ভগবানের চিন্ময় রূপের বর্ণনা ঠিক মন্দিরে তাঁর অর্চা বিগ্রহের মতো। সাধারণত ভগবানের বিগ্রহের নিম্নদেশ পীত পট্টবস্ত্রের দ্বারা আবৃত। সেইটি হচ্ছে তাঁর বৈকুণ্ঠ-বসন, বা চিদাকাশে ভগবান যে বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁর সেই বসন তাঁর গুল্‌ফ পর্যন্ত লম্বিত। এইভাবে, যোগীর ধ্যান করার জন্য যখন এতগুলি দিব্য বস্তু রয়েছে, তখন কোন কাল্পনিক বস্তুর ধ্যান করার কি প্রয়োজন, যা নির্বিশেষবাদী তথাকথিত যোগীরা অনুশীলন করে থাকে।

শ্লোক ২৫

নাভিহ্রদং ভুবনকোশগুহোদরস্থং
যত্রাত্মযোনিধিষণাখিললোকপদ্মম্ ।
ব্যূঢ়ং হরিন্মণিবৃষস্তনয়োরমুষ্য
ধ্যায়েদ্ দ্বয়ং বিশদহারময়ূখগৌরম্ ॥ ২৫ ॥

নাভি-হ্রদম্—নাভি-সরোবর; **ভুবন-কোশ**—সমগ্র বিশ্বের; **গুহা**—আধার; **উদর**—উদরে; **স্থম্**—অবস্থিত; **যত্র**—যেখানে; **আত্ম-যোনি**—ব্রহ্মার; **ধিষণ**—বাস; **অখিল-লোক**—সমগ্র লোক-সমন্বিত; **পদ্মম্**—কমল; **ব্যূঢ়ম্**—বিকশিত হয়েছে; **হরিৎ-মণি**—মরকত মণির মতো; **বৃষ**—অত্যন্ত সুন্দর; **স্তনয়োঃ**—স্তনদ্বয়; **অমুষ্য**—ভগবানের; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **দ্বয়ম্**—যুগল; **বিশদ**—শ্বেত; **হার**—মুক্তামালা; **ময়ূখ**—আলোক থেকে; **গৌরম্**—শ্বেতাভ।

অনুবাদ

তার পর যোগী ভগবানের উদরের মধ্যভাগে নাভি-সরোবরের ধ্যান করবেন। সেই নাভি থেকে ভুবনসমূহের অধিষ্ঠান-স্বরূপ একটি পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। সেই

পদ্ম হচ্ছে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার আবাসস্থল। তার পর যোগী ভগবানের স্তনদ্বয়ের ধ্যান করবেন, যা উৎকৃষ্ট মরকত মণির দ্বারা অলঙ্কৃত, এবং যা তাঁর বক্ষের দুগ্ধধবল মুক্তামালার কিরণের প্রভাবে শ্বেতাভ বলে প্রতীত হয়।

তাৎপর্য

তার পর যোগীকে ভগবানের নাভির ধ্যান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যা হচ্ছে সমস্ত জড় সৃষ্টির আধার। একটি শিশু যেমন তার মায়ের সঙ্গে নাড়ির দ্বারা যুক্ত থাকে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে, প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে এক কমল-নালের দ্বারা যুক্ত। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের চরণ, গুল্ফ এবং জঙ্ঘার সেবায় রত লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন ব্রহ্মার মাতা, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল ভগবানের নাভি থেকে, তাঁর মায়ের জঠর থেকে নয়। এইগুলি ভগবানের অচিন্ত্য কার্যকলাপ, এবং জড় ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করা উচিত নয়, "পিতা কিভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারে?"

ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত হয়েছে যে, ভগবানের প্রতিটি অঙ্গে অন্য যে-কোন অঙ্গের ক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি রয়েছে। যেহেতু তাঁর সব কিছুই চিন্ময়, তাই তাঁর দেহের অঙ্গসমূহ জড় নয়। ভগবান তাঁর কান দিয়ে দেখতে পারেন। জড় কান শুনতে পায়, দেখতে পারে না, কিন্তু *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান তাঁর কান দিয়ে দেখতে পান এবং চোখ দিয়ে শুনতে পান। তাঁর চিন্ময় শরীরের যে-কোন অঙ্গ অন্য যে-কোন অঙ্গের কার্য সম্পাদন করতে পারে। তাঁর উদর হচ্ছে সমস্ত ভুবনের আধার। ব্রহ্মা সমস্ত লোকের স্রষ্টা, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি করার শক্তির উদয় হয় ভগবানের উদর থেকে। ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন সৃজন ক্রিয়ার সর্বদাই ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্ক রয়েছে। যে মুক্তামালা ভগবানের শরীরের উপরিভাগ অলঙ্কৃত করে তাও চিন্ময়, এবং তাই যোগীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ভগবানের বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃতকারী সেই মুক্তাগুলির শ্বেতদ্যুতি দর্শন করার জন্য।

শ্লোক ২৬

বক্ষোঽধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ
পুংসাং মনোনয়ননির্বৃতিমাদধানম্ ।
কণ্ঠং চ কৌস্তুভমণেরধিভূষণার্থং
কুর্যান্মনস্যখিললোকনমস্কৃতস্য ॥ ২৬ ॥

বক্ষঃ—বক্ষ; **অধিবাসম্**—আবাস; **ঋষভস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মহা-বিভূতেঃ**—মহালক্ষ্মীর; **পুংসাম্**—মানুষের; **মনঃ**—মনের; **নয়ন**—নেত্রের; **নির্বৃতিম্**—দিব্য আনন্দ; **আদধানম্**—প্রদান করে; **কণ্ঠম্**—কণ্ঠ; **চ**—ও; **কৌস্তুভ-মণেঃ**—কৌস্তুভ মণির; **অধিভূষণ-অর্থম্**—যা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; **কুর্যাৎ**—ধ্যান করা উচিত; **মনসি**—মনে; **অখিল-লোক**—সমগ্র বিশ্বের দ্বারা; **নমস্কৃতস্য**—পূজিত।

অনুবাদ

তার পর যোগীর কর্তব্য মহালক্ষ্মীর আবাসস্থল পরমেশ্বর ভগবানের বক্ষের ধ্যান করা। ভগবানের বক্ষ মনের সমস্ত দিব্য আনন্দের উৎস এবং নয়নের পূর্ণ সন্তোষ প্রদানকারী। তার পর যোগী সমগ্র বিশ্বের দ্বারা পূজিত ভগবানের কণ্ঠদেশ হৃদয়ে ধ্যান করবেন। ভগবানের কণ্ঠ তাঁর বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান কৌস্তুভ মণির সৌন্দর্য বর্ধন করে।

তাৎপর্য

উপনিষদে বলা হয়েছে যে, ভগবানের বিবিধ শক্তি সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্য সম্পাদন করে। এই সমস্ত অচিন্ত্য শক্তি ভগবানের বক্ষে সঞ্চিত থাকে। সাধারণত মানুষ বলে, ভগবান সর্ব শক্তিমান। সেই শক্তি সমস্ত শক্তির উৎস মহালক্ষ্মীর দ্বারা প্রদর্শিত হয়, যিনি ভগবানের চিন্ময় রূপের বক্ষঃস্থলে অবস্থিত। যে যোগী ভগবানের দিব্য রূপের এই স্থানটির ধ্যান করেন, তিনি বহু জড় শক্তি প্রাপ্ত হতে পারেন, যোগের অষ্ট সিদ্ধি তার অন্তর্গত।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের কণ্ঠ কৌস্তুভ মণির দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ার পরিবর্তে কৌস্তুভ মণিরই সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। সেই মণিটি অধিকতর সুন্দর হয়ে ওঠে কেননা তা ভগবানের গলদেশে অবস্থিত। তাই যোগীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ভগবানের কণ্ঠদেশের ধ্যান করতে। ভগবানের চিন্ময় রূপ মনের মধ্যে ধ্যান করা যায়, অথবা মন্দিরে তাঁর অর্চা-বিগ্রহ এমনভাবে সাজানো যায় যে, সকলেই তাঁর ধ্যান করতে পারে। তাই, মন্দিরে ভগবানের পূজা তাদের জন্য, যারা ভগবানের রূপের ধ্যান করার মতো তত উন্নত নয়। মন্দিরে গিয়ে সর্বদা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং ধ্যানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যোগীর সুবিধা এই যে, তিনি যে-কোন নির্জন স্থানে বসে, ভগবানের রূপের ধ্যান করতে পারেন। কিন্তু অল্প উন্নত ব্যক্তিকে মন্দিরে যেতে হয়, এবং মন্দিরে না যেতে পারলে, তিনি ভগবানের রূপ দর্শন করতে পারেন

না। শ্রবণ, দর্শন অথবা ধ্যানের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের চিন্ময় রূপ; শূন্য বা নিরাকারের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। মন্দিরের দর্শনার্থী, ধ্যানযোগী অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্র থেকে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের কথা শ্রবণকারী, সকলকেই ভগবান দিব্য আনন্দ লাভের আশীর্বাদ প্রদান করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের নয়টি অঙ্গ রয়েছে, যার মধ্যে স্মরণম্ বা ধ্যান হচ্ছে একটি। যোগীরা এই স্মরণ পন্থার সুযোগ গ্রহণ করেন, আর ভক্তিযোগীরা শ্রবণ এবং কীর্তনের পন্থার বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৭

বাহূংশ্চ মন্দরগিরেঃ পরিবর্তনেন
নির্ণিক্তবাহুবলয়ানধিলোকপালান্ ।
সঞ্চিন্তয়েদ্দশশতারমসহ্যতেজঃ
শঙ্খং চ তৎকরসরোরুহরাজহংসম্ ॥ ২৭ ॥

বাহূন্—বাহু; **চ**—এবং; **মন্দর-গিরেঃ**—মন্দর পর্বতের; **পরিবর্তনেন**—ঘূর্ণনের দ্বারা; **নির্ণিক্ত**—মসৃণ এবং উজ্জ্বল হয়েছে; **বাহু-বলয়ান্**—হাতের অলঙ্কারগুলি; **অধিলোক-পালান্**—ব্রহ্মাণ্ডের লোকপালদের উৎস; **সঞ্চিন্তয়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **দশ-শত-অরম্**—সুদর্শন চক্র (সহস্র অর সমন্বিত); **অসহ্য-তেজঃ**—দুঃসহ তেজ; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **চ**—ও; **তৎ-কর**—ভগবানের হাতে; **সরোরুহ**—পদ্মের মতো; **রাজ-হংসম্**—হংসের মতো।

অনুবাদ

তার পর যোগীর ভগবানের চারটি বাহুর ধ্যান করা উচিত, যা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের সমস্ত শক্তির উৎস। তার পর মন্দার পর্বতের ঘূর্ণনের ফলে উজ্জ্বল তাঁর হাতের অলঙ্কারগুলির ধ্যান করা উচিত। তাঁর হস্তধৃত সহস্র অর সমন্বিত এবং দুঃসহ তেজসম্পন্ন সুদর্শন চক্রের ধ্যান করা উচিত, এবং তাঁর কমল-সদৃশ হস্তে রাজহংসের মতো প্রতীয়মান শঙ্খেরও ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

আইন ও শৃঙ্খলার সমস্ত বিভাগগুলি পরমেশ্বর ভগবানের বাহু থেকে উদ্ভূত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের বিধি-ব্যবস্থা বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা ভগবানের বাহু থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। যখন দেবতারা এবং অসুরেরা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করেন, তখন তাঁরা মন্দর পর্বতকে মন্থন-দণ্ডরূপে ব্যবহার করেছিলেন। তখন ভগবান কূর্ম অবতাররূপে সেই মন্দর পর্বতকে তাঁর পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন, এবং তার ফলে সেই পর্বতের ঘূর্ণনের ফলে, তাঁর হাতের অলঙ্কারগুলি মসৃণ এবং উজ্জ্বল হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের হাতের অলঙ্কারগুলি এত উজ্জ্বল এবং দীপ্তিশালী যে, মনে হয় যেন সম্প্রতি তাদের পালিশ করা হয়েছে। ভগবানের হাতের চক্রকে বলা হয় সুদর্শন চক্র এবং তাতে এক হাজার অর রয়েছে। যোগীদের উপদেশ দেওয়া হয়, সেই অরগুলির প্রতিটির উপর ধ্যান করার জন্য। যোগীর কর্তব্য ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের প্রতিটি অবয়বের ধ্যান করা।

শ্লোক ২৮

কৌমোদকীং ভগবতো দয়িতাং স্মরেত
দিগ্ধামরাতিভটশোণিতকর্দমেন ।
মালাং মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাং
চৈত্যস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে ॥ ২৮ ॥

কৌমোদকীম্—কৌমোদকী নামক গদা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **দয়িতাম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **স্মরেত**—স্মরণ করা উচিত; **দিগ্ধাম্**—লিপ্ত; **অরাতি**—শত্রুর; **ভট**—সৈন্যদের; **শোণিত-কর্দমেন**—শোণিত পঙ্কের দ্বারা; **মালাম্**—মালা; **মধু-ব্রত**—মধুকরদের; **বরূথ**—ঝাঁক; **গিরা**—শব্দের দ্বারা; **উপঘুষ্টাম্**—পরিবেষ্টিত; **চৈত্যস্য**—জীবের; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **অমলম্**—শুদ্ধ; **মণিম্**—মুক্তাহার; **অস্য**—ভগবানের; **কণ্ঠে**—গলায়।

অনুবাদ

ভগবানের অতি প্রিয় কৌমোদকী গদার ধ্যান করা উচিত। এই গদা বৈরী-ভাবাপন্ন অসুরদের সংহার করার ফলে, তাদের শোণিতপঙ্কে সিক্ত। গুঞ্জনরত মধুকরকুলের

দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত তাঁর অতি সুন্দর বনমালার, এবং সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব-স্বরূপ তাঁর গলার মুক্তাহারেরও ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

যোগীর কর্তব্য ভগবানের চিন্ময় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ধ্যান করা। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এখানে দুই প্রকার জীবের উল্লেখ করা হয়েছে। একটিকে বলা হয় *অরাতি*। তারা পরমেশ্বর ভগবানের লীলার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। তাদের কাছে ভগবান তাঁর ভয়ঙ্কর গদা নিয়ে আবির্ভূত হন, যা সর্বদাই অসুরদের সংহার করার ফলে শোণিতপঙ্কে সিক্ত। অসুরেরাও পরমেশ্বর ভগবানের পুত্র। যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—বিভিন্ন প্রকার সমস্ত যোনির জীবেরা ভগবানের সন্তান। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুই প্রকার জীব রয়েছে, যারা দুইটি বিভিন্নভাবে আচরণ করে। মানুষ যেমন মণিরত্ন তার বক্ষে এবং গলায় ধারণ করে তাদের রক্ষা করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও শুদ্ধ জীবেদের তাঁর গলায় ধারণ করেন। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত জীবেরা তাঁর গলায় মুক্তার মতো বিরাজমান। আর যারা ভগবানের লীলার প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন অসুর, তাদের তিনি অধঃপতিত জীবের শোণিতলিপ্ত গদার দ্বারা দণ্ড দান করেন। সেই গদা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, কেননা সেই অস্ত্রটির দ্বারা তিনি অসুরদের দেহ বিধ্বস্ত করে রক্ত মিশ্রিত করেন। জল এবং মাটির মিশ্রণের ফলে যেমন পঙ্ক উৎপন্ন হয়, তেমনই ভগবানের শত্রুদের বা নাস্তিকদের মাটির শরীর তাঁর গদাঘাতে তাদের রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় পঙ্কে পরিণত হয়।

শ্লোক ২৯

ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ গৃহীতমূর্তেঃ
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতো বদনারবিন্দম্ ।
যদ্বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন
বিদ্যোতিতামলকপোলমুদারনাসম্ ॥ ২৯ ॥

ভৃত্য—ভক্তদের জন্য; **অনুকম্পিত-ধিয়া**—অনুকম্পাবশত; **ইহ**—এই জগতে; **গৃহীত-মূর্তেঃ**—যিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন; **সঞ্চিন্তয়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বদন**—মুখমণ্ডল; **অরবিন্দম্**—কমল-সদৃশ; **যৎ**—যা; **বিস্ফুরন্**—দীপ্তিমান; **মকর**—মকরাকৃতি; **কুণ্ডল**—কর্ণকুণ্ডল; **বল্গিতেন**—

দোদুল্যমান; বিদ্যোতিত—উজ্জ্বল; অমল—স্ফটিক-স্বচ্ছ; কপোলম্—গাল; উদার—উন্নত; নাসম্—নাক।

অনুবাদ

তার পর যোগী ভগবানের কমল-সদৃশ মুখমণ্ডলের ধ্যান করবেন, যিনি তাঁর উৎসুক ভক্তদের অনুকম্পা করার জন্য তাঁর বিভিন্ন রূপ এই জগতে প্রকট করেন। তাঁর সুকোমল গণ্ডস্থল দীপ্তিমান মকর কুণ্ডলের সঞ্চালনে উজ্জ্বল, এবং তাঁর উন্নত নাসিকা তাঁর মুখ-কমলকে এক অপূর্ব শোভায় উদ্ভাসিত করেছে।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি গভীর অনুকম্পাবশত এই জড় জগতে অবতরণ করেন। এই জড় জগতে ভগবানের আবির্ভাবের দুইটি কারণ রয়েছে। যখন ধর্ম আচরণের ত্রুটি হয় এবং অধর্মের প্রাধান্য হয়, তখন ভগবান তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অভক্তদের ধ্বংস করার জন্য অবতরণ করেন। তাঁর আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর ভক্তদের সান্ত্বনা প্রদান করা। অসুরদের সংহার করার জন্য তাঁকে স্বয়ং আসতে হয় না, কারণ তাঁর বহু প্রতিনিধি রয়েছে; এমন কি তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়ারও তাদের সংহার করার যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। কিন্তু তাঁর ভক্তদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করার জন্য তিনি যখন আসেন, তখন তিনি আনুষঙ্গিকভাবে অভক্তদের সংহার করেন।

ভগবান তাঁর বিশেষ প্রকারের ভক্তদের প্রিয় কোন বিশেষ রূপে আবির্ভূত হন। ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে, কিন্তু সেই সবই এক পরমতত্ত্ব। *ব্রহ্মসংহিতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*—ভগবানের সমস্ত রূপ এক, কিন্তু কিছু ভক্ত তাঁকে রাধা-কৃষ্ণরূপে দেখতে চান, অন্যেরা তাঁকে সীতা ও রামচন্দ্ররূপে পছন্দ করেন, আবার অনেকে তাঁকে লক্ষ্মী-নারায়ণরূপে দেখতে চান, এবং অন্য ভক্তেরা তাঁকে তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ বা বাসুদেবরূপে দর্শন করতে চান। ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে, এবং বিশেষ ভক্তদের বাসনা অনুসারে কোন বিশেষ রূপে তিনি আবির্ভূত হন। যোগীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ভক্তগণ কর্তৃক অনুমোদিত রূপের ধ্যান করতে। যোগী কখনও কোন কল্পনাপ্রসূত রূপের ধ্যান করতে পারেন না। তথাকথিত যোগীরা একটি বৃত্ত বা লক্ষ্য তৈরি করে, কতকগুলি অর্থহীন কার্যে লিপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে, যোগীর ভগবানের সেই রূপের ধ্যান করা উচিত, যা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত উপলব্ধি করেছেন। যোগী মানে হচ্ছে ভক্ত। যে সমস্ত যোগী শুদ্ধ ভক্ত নয়, তাদের কর্তব্য ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এইভাবে অনুমোদিত হয়েছে যে রূপ, সেই রূপের ধ্যান করা যোগীর কর্তব্য; সে ভগবানের কোন মনগড়া রূপ তৈরি করতে পারে না।

শ্লোক ৩০

যচ্ছ্রীনিকেতমলিভিঃ পরিসেব্যমানং
ভূত্যা স্বয়া কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্টম্ ।
মীনদ্বয়াশ্রয়মধিক্ষিপদব্জনেত্রং
ধ্যায়েন্মনোময়মতন্দ্রিত উল্লসদ্ভ্রু ॥ ৩০ ॥

যৎ—ভগবানের যে মুখমণ্ডল; **শ্রী-নিকেতম্**—কমল; **অলিভিঃ**—মধুকরদের দ্বারা; **পরিসেব্যমানম্**—পরিবেষ্টিত; **ভূত্যা**—শোভার দ্বারা; **স্বয়া**—তার; **কুটিল**—কুঞ্চিত; **কুন্তল**—কেশের; **বৃন্দ**—গুচ্ছ; **জুষ্টম্**—অলঙ্কৃত; **মীন**—মীন; **দ্বয়**—এক জোড়া; **আশ্রয়ম্**—নিবাস; **অধিক্ষিপৎ**—নিন্দিত; **অব্জ**—পদ্ম; **নেত্রম্**—নয়ন; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **মনঃ-ময়ম্**—মনে নির্মিত; **অতন্দ্রিতঃ**—সতর্ক; **উল্লসৎ**—নর্তনরত; **ভ্রু**—ভ্রূ।

অনুবাদ

যোগী তার পর ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডলের ধ্যান করবেন, যা কুঞ্চিত কেশদাম, পদ্ম-সদৃশ নয়ন এবং নৃত্যপর ভ্রূযুগলের দ্বারা শোভিত। তাঁর মুখকমল মধুকর পরিবেষ্টিত পদ্মফুলকে লজ্জা দেয়, এবং তাঁর নেত্রদ্বয় তাদের শোভার দ্বারা সন্তরণশীল মীনযুগলকে লজ্জা দেয়।

তাৎপর্য

এখানে *ধ্যায়েন্মনোময়ম্* বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ। *মনোময়ম্* মানে কল্পনা নয়। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, যোগী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে-কোন রূপের কল্পনা করতে পারে, কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগীকে অবশ্যই ভক্তের দ্বারা উপলব্ধ রূপের ধ্যান করতে হবে। ভক্তেরা কখনও ভগবানের রূপের কল্পনা করেন না। তাঁরা কোন কাল্পনিক বস্তুতে সন্তুষ্ট হন না। ভগবানের বিভিন্ন শাশ্বত রূপ রয়েছে; প্রতিটি ভক্তই ভগবানের কোন বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, এবং তাই তিনি ভগবানের সেই রূপের আরাধনা করে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

ভগবানের বিভিন্ন রূপ শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ভগবানের রূপ আটটি বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তা মাটি, পাথর, কাঠ, রং, বালুকা ইত্যাদির দ্বারা ভক্তের সঙ্গতি অনুসারে প্রকাশিত হতে পারে।

মনোময়ম্ হচ্ছে মনের ভিতর ভগবানের স্বরূপ অঙ্কন। এইটি আটটি বিভিন্ন প্রকারে ভগবানের রূপ প্রকাশের একটি। এইটি কল্পনা নয়। ভগবানের প্রকৃত রূপের ধ্যান বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু তা বলে কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবানের রূপের কল্পনা করতে হবে। এই শ্লোকে দুইটি তুলনা দেওয়া হয়েছে—প্রথমটি হচ্ছে ভগবানের মুখমণ্ডলকে পদ্মের সঙ্গে, এবং তার পর তাঁর কুঞ্চিত কেশদামকে সেই পদ্মের চারপাশে গুঞ্জায়মান অলিকুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং তাঁর নয়নযুগলকে সন্তরণশীল মীনযুগলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জলের মধ্যে পদ্ম যখন অলিকুল এবং মৎস্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তখন তা অত্যন্ত সুন্দর হয়ে ওঠে। ভগবানের মুখমণ্ডল পূর্ণ। তাঁর সৌন্দর্য পদ্মফুলের মতো স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে নিন্দা করে।

শ্লোক ৩১

তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোর-
তাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষ্ণোঃ ।
স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং
ধ্যায়েচ্চিরং বিপুলভাবনয়া গুহায়াম্ ॥ ৩১ ॥

তস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; **অবলোকম্**—দৃষ্টিপাত; **অধিকম্**—বারংবার; **কৃপয়া**—অনুকম্পা সহকারে; **অতিঘোর**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **তাপ-ত্রয়**—ত্রিতাপ দুঃখ; **উপশমনায়**—প্রশমিত করার জন্য; **নিসৃষ্টম্**—নিক্ষেপ করে; **অক্ষ্ণোঃ**—তাঁর চক্ষু থেকে; **স্নিগ্ধ**—স্নেহযুক্ত; **স্মিত**—হাস্য; **অনুগুণিতম্**—সংযুক্ত; **বিপুল**—প্রচুর; **প্রসাদম্**—কৃপাপূর্ণ; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **চিরম্**—দীর্ঘ কাল; **বিপুল**—পূর্ণ; **ভাবনয়া**—ভক্তি সহকারে; **গুহায়াম্**—হৃদয়ে।

অনুবাদ

যোগীর কর্তব্য পূর্ণ ভক্তি সহকারে ভগবানের অনুকম্পাপূর্ণ চক্ষুর অবলোকন একাগ্রচিত্তে ধ্যান করা, কারণ তা তাঁর ভক্তদের ভয়ঙ্কর ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত করে। তাঁর সুস্নিগ্ধ হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাত তাঁর অন্তহীন কৃপায় পূর্ণ।

তাৎপর্য

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড় দেহে বদ্ধ অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে স্বাভাবিকভাবে উৎকণ্ঠা এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে। জড়া প্রকৃতির প্রভাব কেউই এড়াতে পারে না, এমন কি পারমার্থিক স্তরেও নয়। কখনও কখনও অশান্তি আসে, কিন্তু ভক্ত যখনই পরমেশ্বর ভগবানের সুন্দর রূপ অথবা হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের কথা চিন্তা করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যায়। ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি অসীম অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, এবং তাঁর কৃপার সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হচ্ছে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, যা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের প্রতি অনুকম্পায় পূর্ণ।

শ্লোক ৩২

হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্র-
শোকাশ্রুসাগরবিশোষণমত্যুদারম্ ।
সম্মোহনায় রচিতং নিজমায়য়াস্য
ভ্রূমণ্ডলং মুনিকৃতে মকরধ্বজস্য ॥ ৩২ ॥

হাসম্—হাস্য; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **অবনত**—প্রণত; **অখিল**—সমস্ত; **লোক**—লোকের; **তীব্র-শোক**—গভীর দুঃখজাত; **অশ্রু-সাগর**—অশ্রুর সমুদ্র; **বিশোষণম্**—শোষণ করতে; **অতি-উদারম্**—অত্যন্ত উপকারী; **সম্মোহনায়**—মোহিত করার জন্য; **রচিতম্**—প্রকাশিত; **নিজ-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **অস্য**—তাঁর; **ভ্রূ-মণ্ডলম্**—বঙ্কিম ভ্রূযুগল; **মুনি-কৃতে**—সাধুদের মঙ্গলের জন্য; **মকর-ধ্বজস্য**—কামদেবের।

অনুবাদ

যোগীর এইভাবে ভগবান শ্রীহরির অত্যন্ত মনোরম হাস্যের ধ্যান করা উচিত, যা তাঁর শরণাগতের গভীর শোক থেকে উৎপন্ন অশ্রুর সমুদ্র শোষণ করে। যোগীর ভগবানের বঙ্কিম ভ্রূযুগলেরও ধ্যান করা উচিত, যা সাধুদের উপকারার্থে কামদেবকে মোহিত করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকট করেছেন।

তাৎপর্য

সমগ্র বিশ্ব দুঃখময়, এবং তাই এই জড় জগতের অধিবাসীরা সর্বদাই তীব্র শোকে নিরন্তর অশ্রু বর্ষণ করছে। সেই অশ্রুর একটি বিশাল সমুদ্র রয়েছে, কিন্তু যিনি

পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তাঁর জন্য এই অশ্রুর সমুদ্র তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে যায়। মানুষের প্রয়োজন কেবল ভগবানের মনোরম হাস্য দর্শন করা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন ভগবানের মধুর হাস্য দর্শন করেন, তাঁর সমস্ত জড়-জাগতিক শোক তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়ে যায়।

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের ভ্রূযুগল এতই সুন্দর যে, তা ইন্দ্রিয় সুখভোগের সমস্ত আকর্ষণের কথা ভুলিয়ে দেয়। বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, কেননা তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের মোহে শৃঙ্খলিত হয়েছে, বিশেষ করে মৈথুন সুখে। কামদেবকে বলা হয় *মকরধ্বজ*। পরমেশ্বর ভগবানের সুন্দর ভ্রূযুগল সাধু এবং ভক্তদের কাম এবং মৈথুন সুখের আকর্ষণে মোহিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। মহান আচার্য যামুনাচার্য বলেছেন যে, যখন থেকে তিনি ভগবানের মনোমুগ্ধকর লীলা দর্শন করেছেন, তখন থেকে যৌন জীবনের আকর্ষণ তাঁর কাছে জঘন্য বলে মনে হয়েছে, এবং মনের মধ্যে এই চিন্তার উদয় হলে, তাঁর মুখ বিকৃত হয়েছে এবং ঘৃণাভরে সেই চিন্তার প্রতি তিনি থুথু ফেলেছেন। কেউ যদি মৈথুনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের মধুর হাস্য এবং মনোহর ভ্রূযুগল দর্শন করতে হবে।

শ্লোক ৩৩

ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরোষ্ঠ-
ভাসারুণায়িততনুদ্বিজকুন্দপঙ্‌ক্তি ।
ধ্যায়েৎস্বদেহকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণো-
র্ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্‌দিদৃক্ষেৎ ॥ ৩৩ ॥

ধ্যান-অয়নম্—অনায়াসে ধ্যান করা যায়; **প্রহসিতম্**—হাস্য; **বহুল**—প্রচুর; **অধর-ওষ্ঠ**—তাঁর ঠোঁটের; **ভাস**—কান্তির দ্বারা; **অরুণায়িত**—আরক্তিম; **তনু**—ক্ষুদ্র; **দ্বিজ**—দন্ত; **কুন্দ-পঙ্‌ক্তি**—কুন্দ-কলির পঙ্‌ক্তির মতো; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **স্ব-দেহ-কুহরে**—তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; **অবসিতস্য**—যিনি বাস করেন; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **ভক্ত্যা**—ভক্তিপূর্বক; **আর্দ্রয়া**—প্রেমাপ্লুত; **অর্পিত-মনাঃ**—চিত্ত নিবদ্ধ করে; **ন**—না; **পৃথক্**—অন্য কিছু; **দিদৃক্ষেৎ**—দর্শন করার ইচ্ছা।

অনুবাদ

যোগীর কর্তব্য প্রেমাপ্লুত ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মধুর হাস্য তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ধ্যান করা। বিষ্ণুর এই হাস্য এতই মনোরম যে, তা অনায়াসে ধ্যান করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান যখন হাসেন, তখন কুন্দকলির পঙ্‌ক্তির মতো তাঁর ক্ষুদ্র দন্তরাজি তাঁর অধরৌষ্ঠের কান্তিতে অরুণাভ হয়ে ওঠে। যোগী যখন একবার তাঁর মনকে ভগবানের এই মধুর হাস্যে স্থির করেন, তখন আর তাঁর অন্য কিছু দর্শন করার বাসনা থাকে না।

তাৎপর্য

এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যোগী যেন ভগবানের স্মিত হাস্য অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর, ভগবানের উচ্চ হাস্য অবলোকন করেন। ভগবানের স্মিত হাস্য, উচ্চ হাস্য, মুখমণ্ডল, অধরৌষ্ঠ, দন্তরাজি ইত্যাদির এই বিশেষ বর্ণনা স্পষ্টভাবে সূচিত করে যে, ভগবান নিরাকার নন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের স্মিত হাস্য অথবা উচ্চ হাস্যের ধ্যান করা উচিত। তা ছাড়া অন্য কোন কার্য ভক্তের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নির্মল করতে পারে না। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর হাস্যের অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি যখন হাসেন, তখন কুন্দকলির মতো তাঁর ক্ষুদ্র দন্তরাজি তাঁর রক্তিম অধরৌষ্ঠের দ্যুতি প্রতিবিম্বিত করে, তৎক্ষণাৎ আরক্তিম হয়ে ওঠে। যোগী যদি ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্থাপন করতে পারেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হবেন। অর্থাৎ, কেউ যখন তাঁর অন্তরে ভগবানের সৌন্দর্য দর্শনে মগ্ন হন, তখন আর জড়-জাগতিক আকর্ষণ তাঁকে বিচলিত করতে পারে না।

শ্লোক ৩৪

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **হরৌ**—ভগবান শ্রীহরির প্রতি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রতিলব্ধ**—বিকশিত; **ভাবঃ**—শুদ্ধ প্রেম; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **দ্রবৎ**—দ্রবীভূত;

হৃদয়ঃ—হৃদয়; **উৎপুলকঃ**—রোমাঞ্চ; **প্রমোদাৎ**—অত্যধিক আনন্দের ফলে; **ঔৎকণ্ঠ্য**—তীব্র প্রেমে; **বাষ্প-কলয়া**—অশ্রুধারায়; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **অর্দ্যমানঃ**—নিমজ্জিত; **তৎ**—তা; **চ**—এবং; **অপি**—যদি; **চিত্ত**—মন; **বড়িশম্**—বড়শি; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **বিযুঙ্ক্তে**—নিবৃত্ত হয়।

অনুবাদ

এই পন্থা অনুসরণের দ্বারা যোগীর চিত্তে ভগবান শ্রীহরির প্রতি ধীরে ধীরে ভাবের উদয় হয়। তখন আনন্দের আতিশয্যে তাঁর দেহে রোমাঞ্চ হয়, এবং তাঁর চিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত হয়, তিনি তখন গভীর প্রেমে নিরন্তর আনন্দ অশ্রুতে অবগাহন করেন। বড়শির দ্বারা মাছকে আকর্ষণ করার মতো তাঁর চিত্ত, যা ভগবানকে আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তা ধীরে ধীরে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধ্যান, যা হচ্ছে মনের ক্রিয়া তা সমাধির পূর্ণ অবস্থা নয়। প্রথমে মনকে পরমেশ্বর ভগবানের রূপ আকর্ষণ করার জন্য উপযোগ করা হয়, কিন্তু উন্নত স্তরে মনকে ব্যবহার করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ভক্ত তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করার দ্বারা ভগবানের সেবা করতে শুরু করেন। অর্থাৎ, শুদ্ধ ভক্তি লাভ না করা পর্যন্ত ধ্যানের যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করার জন্য মনের ব্যবহার হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি যখন ধ্যানের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন আর কোন বিশেষ স্থানে বসে ভগবানের রূপের ধ্যান করার চেষ্টা করার প্রয়োজন থাকে না। তিনি তখন এতই অভ্যস্ত হয়ে যান যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। মনকে যখন জোর করে ভগবানের রূপের ধ্যানে নিযুক্ত করা হয়, তাকে বলা হয় *নির্বীজ-যোগ* বা প্রাণহীন যোগ, কারণ যোগী তখন আপনা থেকেই ভগবানের সেবায় যুক্ত হন না। কিন্তু তিনি যখন নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করেন, তাকে বলা *সবীজ-যোগ* বা সজীব যোগ। এই *সবীজ-যোগের* স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত।

দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত, যে কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। পূর্ণ প্রেম লাভ করার ফলে, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ভক্তির প্রভাবে ভগবানের প্রতি প্রেম পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তখন কৃত্রিমভাবে ভগবানের রূপের ধ্যান না করেও, নিরন্তর ভগবানকে দর্শন করা যায়। তাঁর দৃষ্টি দিব্য কেলনা তাঁর আর অন্য কোন কার্য থাকে না। চিন্ময়

উপলব্ধির এই স্তরে মনকে কৃত্রিমভাবে নিযুক্ত করার আর আবশ্যকতা থাকে না। যেহেতু নিম্ন স্তর থেকে ভগবদ্ভক্তির স্তরে আসার উপায়-স্বরূপ ধ্যানের পন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তাই যাঁরা ইতিমধ্যেই ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা এই ধ্যানের স্তর অতিক্রম করেছেন। সেই সিদ্ধ অবস্থাকে বলা হয় কৃষ্ণভক্তি।

শ্লোক ৩৫

মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্বিষয়ং বিরক্তং
নির্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চিঃ ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ॥ ৩৫ ॥

মুক্ত-আশ্রয়ম্—মুক্তিতে স্থিত; **যর্হি**—যে সময়; **নির্বিষয়ম্**—বিষয় থেকে বিরক্ত; **বিরক্তম্**—উদাসীন; **নির্বাণম্**—নিবৃত্ত; **ঋচ্ছতি**—লাভ করে; **মনঃ**—মন; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **যথা**—যেমন; **অর্চিঃ**—দীপশিখা; **আত্মানম্**—মন; **অত্র**—সেই সময়; **পুরুষ**—জীবাত্মা; **অব্যবধানম্**—ব্যবধান-রহিত; **একম্**—এক; **অন্বীক্ষতে**—অনুভব করে; **প্রতিনিবৃত্ত**—মুক্ত; **গুণ-প্রবাহঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রবাহ থেকে।

অনুবাদ

মন যখন এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয় এবং জড় বিষয় থেকে বিরক্ত হয়, তখন দীপশিখা যেমন তৈলের অভাবে নির্বাপিত হয়ে যায়, তেমনই মনও ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় গ্রহণের প্রবাহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এবং ব্যবধান-রহিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে।

তাৎপর্য

জড় জগতে মনের কার্য হচ্ছে সংকল্প এবং বিকল্প। মন যতক্ষণ জড় চেতনায় থাকে, ততক্ষণ তাকে বলপূর্বক পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার শিক্ষা দিতে হয়, কিন্তু তা যখন বাস্তবিকভাবে ভগবৎ প্রেমের স্তরে উন্নীত হয়, তখন তা আপনা থেকেই ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়। সেই অবস্থায় যোগীর ভগবানের সেবা ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তা থাকে না। মনকে এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করাকে বলা হয় *নির্বাণ*, বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে মনকে এক করা।

নির্বাণের সর্ব শ্রেষ্ঠ উদাহরণ *ভগবদ্গীতায়* দেওয়া হয়েছে। প্রথমে অর্জুনের মন কৃষ্ণের মন থেকে আলাদা ছিল। কৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে, অর্জুন যেন যুদ্ধ করে, কিন্তু অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি, তাই তাঁদের মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কাছে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করার পর, অর্জুন তাঁর মনকে কৃষ্ণের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। একেই বলা হয় একাত্মতা। এই একাত্মতার ফলে কিন্তু অর্জুন এবং কৃষ্ণ তাঁদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেননি। মায়াবাদীরা সেই কথা বুঝতে পারে না। তারা মনে করে যে, একাত্মতা মানে হচ্ছে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা *ভগবদ্গীতায়* দেখতে পাই যে, ব্যক্তিগত অস্তিত্ব হারিয়ে যায় না। ভগবৎ প্রেমে মন যখন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়, তখন সেই মন পরমেশ্বর ভগবানের মন হয়ে যায়। মন আর তখন স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করে না, অথবা ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করা ব্যতীত অন্য আর কোনভাবে ক্রিয়া করে না। ব্যষ্টি মুক্ত আত্মার আর অন্য কোন কর্ম থাকে না। *প্রতিনিবৃত্তগুণ-প্রবাহঃ*। বদ্ধ অবস্থায় মন সর্বদাই জড় জগতের তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু চিন্ময় স্তরে, জড়া প্রকৃতির গুণগুলি আর ভক্তের মনকে বিচলিত করতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া ভক্তের আর কোন চিন্তা থাকে না। সেইটি হচ্ছে সিদ্ধির সর্বোচ্চ অবস্থা, যাকে বলা হয় *নির্বাণ* বা *নির্বাণ মুক্তি*। এই স্তরে মন সম্পূর্ণরূপে জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

যথার্চিঃ। *অর্চিঃ* মানে 'দীপশিখা'। দীপ যখন ভেঙ্গে যায় অথবা তেল ফুরিয়ে যায়, তখন আমরা দেখি যে দীপ শিখাটি নির্বাপিত হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুসারে, শিখাটি নিভে যায় না; তা সংরক্ষিত থাকে। এটিই হচ্ছে শক্তির সংরক্ষণ। তেমনই মন যখন জড় স্তরে কার্য করা বন্ধ করে দেয়, তখন তা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় সংরক্ষিত হয়। মনের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে ধারণা মায়াবাদীরা পোষণ করে, তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—মনের কার্যকলাপের নিবৃত্তির অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত কার্যকলাপের নিবৃত্তি।

শ্লোক ৩৬

সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে ।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্তরি দুঃখয়োর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—যোগী; **অপি**—অধিকন্তু; **এতয়া**—এর দ্বারা; **চরময়া**—অন্তিম; **মনসঃ**—মনের; **নিবৃত্ত্যা**—কর্মফলের নিবৃত্তির দ্বারা; **তস্মিন্**—তার; **মহিম্নি**—চরম মহিমা; **অবসিতঃ**—অবস্থিত; **সুখ-দুঃখ-বাহ্যে**—সুখ এবং দুঃখের অতীত; **হেতুত্বম্**—কারণ; **অপি**—প্রকৃতপক্ষে; **অসতি**—অবিদ্যার ফল; **কর্তরি**—অহঙ্কারে; **দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের; **যৎ**—যা; **স্ব-আত্মন্**—নিজেকে; **বিধত্তে**—আরোপ করে; **উপলব্ধ**—অনুভব করে; **পর-আত্ম**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কাষ্ঠঃ**—পরম সত্য।

অনুবাদ

এইভাবে সর্বোচ্চ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, মন সমস্ত কর্মফল থেকে নিবৃত্ত হয়ে, সমস্ত জড় সুখ এবং দুঃখের ধারণার অতীত স্বীয় মহিমায় অবস্থিত হয়। যোগী তখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উপলব্ধি করেন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে, সুখ-দুঃখ এবং তাদের প্রতিক্রিয়া, যেগুলির কারণ তিনি স্বয়ং বলে মনে করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা অবিদ্যাজনিত অহঙ্কারের ফল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের বিস্মৃতিই হচ্ছে অবিদ্যার পরিণাম। যোগ অভ্যাসের দ্বারা নিজেকে ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করার অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে শাশ্বত প্রেমের সম্পর্ক। ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করাই জীবের অস্তিত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেই মধুর সম্পর্কের বিস্মৃতিকে বলা হয় অবিদ্যা, এবং অবিদ্যার ফলে জীব প্রকৃতির তিনটি গুণের বশীভূত হয়ে, নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে। ভক্তের মন যখন শুদ্ধ হয়ে যায় এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর মনকে যুক্ত করতে হবে, তখন তিনি চিন্ময় স্তরের সিদ্ধি লাভ করেন, যা ভৌতিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির অতীত।

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় কর্ম করে, ততক্ষণ তাকে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের অনুভূতির অধীন হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সুখ বলে কিছু নেই। একটি উন্মাদ ব্যক্তির কার্যকলাপে যেমন সুখ বলে কিছু নেই, তেমনই মনঃকল্পিত সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই দুঃখময়।

মন যখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করতে শুরু করে, তখন জীবের চিন্ময় স্তর লাভ হয় জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনাই হচ্ছে অবিদ্যার কারণ। সেই বাসনা যখন সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় এবং জীবের বাসনা পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন সিদ্ধি স্তর লাভ হয়। *উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ* ।

উপলব্ধ মানে হচ্ছে 'উপলব্ধি।' উপলব্ধি স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের ইঙ্গিত করে। সিদ্ধ বা মুক্ত অবস্থায়, প্রকৃত উপলব্ধি সম্ভব। *নিবৃত্ত্যা* মানে জীব তার ব্যক্তিগত সত্তা বজায় রাখে; একাত্মতা মানে হচ্ছে ভগবানের সুখকে নিজের সুখ বলে উপলব্ধি করা। পরমেশ্বর ভগবান আনন্দময়। *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*—ভগবান স্বাভাবিকভাবে দিব্য আনন্দে পূর্ণ। মুক্ত অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে একাত্মতার অর্থ হচ্ছে, তখন আর আনন্দ ছাড়া অন্য কোন কিছুর উপলব্ধি থাকে না। কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তাটি বর্তমান থাকে, তা না হলে উপলব্ধ শব্দটি, যার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে দিব্য আনন্দের উপলব্ধি, এই শব্দটির ব্যবহার হত না।

শ্লোক ৩৭

দেহং চ তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎস্বরূপম্ ।
দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ ৩৭ ॥

দেহম্—জড় দেহ; **চ**—এবং; **তম্**—তা; **ন**—না; **চরমঃ**—অন্তিম; **স্থিতম্**—উপবিষ্ট; **উত্থিতম্**—উত্থিত; **বা**—অথবা; **সিদ্ধঃ**—সিদ্ধ জীবাত্মা; **বিপশ্যতি**—উপলব্ধি করতে পারেন; **যতঃ**—যেহেতু; **অধ্যগমৎ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **স্ব-রূপম্**—তার প্রকৃত পরিচয়; **দৈবাৎ**—ভাগ্যক্রমে; **উপেতম্**—আগত; **অথ**—অধিকন্তু; **দৈব-বশাৎ**—ভাগ্যক্রমে; **অপেতম্**—প্রস্থান করেছেন; **বাসঃ**—বসন; **যথা**—যেমন; **পরিকৃতম্**—পরিহিত; **মদিরা-মদ-অন্ধঃ**—মদ্য পানের ফলে যে অন্ধ হয়ে গেছে।

অনুবাদ

যেহেতু তিনি তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, পূর্ণরূপে সিদ্ধ জীবের তাই আর তখন বোধ থাকে না, তাঁর জড় দেহটি কিভাবে চলাফেরা করছে এবং কার্য করছে, ঠিক যেমন মদ্য পানে উন্মত্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে না, তার শরীরে বসন আছে কি নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে জীবনের এই অবস্থাটির ব্যাখ্যা করেছেন। যাঁর মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এবং যিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁর আর জড় দেহের আবশ্যকতাগুলির কথা মনে থাকে না।

শ্লোক ৩৮

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ৩৮ ॥

দেহঃ—দেহ; **অপি**—অধিকন্তু; **দৈব-বশ-গঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন; **খলু**—প্রকৃত পক্ষে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **যাবৎ**—যতখানি; **স্ব-আরম্ভকম্**—নিজে যা আরম্ভ করেছিল; **প্রতিসমীক্ষতে**—কার্য করতে থাকে; **এব**—নিশ্চয়ই; **স-অসুঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ সহ; **তম্**—দেহ; **স-প্রপঞ্চম্**—তার বিস্তার সহ; **অধিরূঢ়-সমাধি-যোগঃ**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমাধিতে স্থিত; **স্বাপ্নম্**—স্বপ্নজনিত; **পুনঃ**—পুনরায়; **ন**—না; **ভজতে**—নিজের বলে মনে করে; **প্রতিবুদ্ধ**—জাগ্রত; **বস্তুঃ**—স্বরূপ।

অনুবাদ

এই প্রকার মুক্ত যোগীর ইন্দ্রিয় সহ শরীরের দায়িত্ব পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করেন, এবং সেই দেহ আরব্ধ কর্মের সমাপ্তি পর্যন্ত কার্য করে। স্বরূপে জাগ্রত মুক্ত ভক্ত এইভাবে যোগের চরম সিদ্ধ অবস্থা সমাধিতে অবস্থিত হয়ে, সেই দেহকে এবং দেহ সম্পর্কিত পুত্র-কলত্রাদিকে আর ভজনা করেন না। এইভাবে তিনি তাঁর দেহের কার্যকলাপকে স্বপ্নদৃষ্ট কার্যকলাপ বলে মনে করেন।

তাৎপর্য

নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্থাপন হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত জীব তাঁর দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকেন, তাঁর দেহের কার্যকলাপ তাঁকে প্রভাবিত কেন করে না? তিনি কি তা হলে তাঁর কর্ম এবং তার ফলের দ্বারা কলুষিত হন না? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মুক্ত জীবের শরীরের দায়িত্ব ভগবান গ্রহণ করেন। সেইটি আর তখন জীবের জীবনী শক্তির প্রভাবে কার্য করে না; তা কেবল তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে কার্য করে যায়। ঠিক যেমন একটি ইলেকট্রিক পাখার সুইচ বন্ধ করে দেওয়ার পরেও সেই পাখাটি কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকে। সেইটি আর বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে ঘোরে না, কিন্তু পূর্বের ঘূর্ণনের ফলে তা ঘুরতে থাকে; তেমনই, মুক্ত জীবাত্মা একজন সাধারণ মানুষের মতো কর্ম করছেন বলে মনে হলেও, তাঁর কার্যকলাপ তাঁর পূর্বকৃত কর্মের অনুক্রম বলে বুঝতে হবে। স্বপ্নে মানুষ নিজেকে অনেক শরীরে বিস্তারিত দেখতে পারে, কিন্তু সে

যখন জেগে ওঠে, তখন সে বুঝতে পারে যে, সেই সমস্ত শরীরগুলি মিথ্যা। তেমনই, মুক্ত জীবাত্মার দেহ সম্বন্ধীয় স্ত্রী-পুত্র, গৃহ ইত্যাদি বিস্তার থাকলেও, তাদের প্রতি তাঁর কোন মমত্ববোধ থাকে না। তিনি জানেন যে, সেই সবই জড়-জাগতিক স্বপ্ন থেকে উৎপন্ন। স্থূল জড় উপাদান থেকে স্থূল জড় দেহ গঠিত হয়, এবং সূক্ষ্ম জড় দেহ তৈরি হয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কলুষিত চেতনা থেকে। কেউ যদি স্বপ্নদৃষ্ট তার সূক্ষ্ম জড় দেহটিকে মিথ্যা বলে বুঝতে পারে এবং সেই দেহের সঙ্গে তার নিজের পরিচয় স্থাপন করে না, তা হলে অবশ্যই একজন জাগ্রত ব্যক্তির তার স্থূল দেহের সঙ্গে তার পরিচয় স্থাপন করা উচিত নয়। জাগ্রত ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের কার্যকলাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, তেমনই জাগ্রত মুক্ত আত্মার বর্তমান শরীরের কার্যকলাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যেহেতু তিনি তাঁর স্বরূপ অবগত হয়েছেন, তাই তিনি আর কখনও তাঁর দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেন না।

শ্লোক ৩৯

যথা পুত্রাচ্চ বিত্তাচ্চ পৃথঙ্মর্ত্যঃ প্রতীয়তে ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্দেহাদেঃ পুরুষস্তথা ॥ ৩৯ ॥

যথা—যেমন; **পুত্রাৎ**—পুত্র থেকে; **চ**—এবং; **বিত্তাৎ**—বিত্ত থেকে; **চ**—ও; **পৃথক্**—ভিন্নভাবে; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল মানুষ; **প্রতীয়তে**—বোঝা যায়; **অপি**—যদিও; **আত্মত্বেন**—স্বভাবত; **অভিমতাৎ**—যার প্রতি স্নেহ রয়েছে; **দেহ-আদেঃ**—তার জড়দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন থেকে; **পুরুষঃ**—মুক্ত জীব; **তথা**—তেমনই।

অনুবাদ

পরিবার এবং সম্পত্তির প্রতি অত্যধিক স্নেহের ফলে, মানুষ যেমন তার পুত্র এবং তার বিত্তকে নিজের বলে মনে করে, এবং তার জড় শরীরের প্রতি আসক্তির ফলে, তার এই প্রকার মমত্ব বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষ বুঝতে পারে যে, তার পরিবার এবং তার বিত্ত তার থেকে ভিন্ন, তেমনই মুক্ত জীব বুঝতে পারে যে, তার দেহ তার থেকে ভিন্ন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে প্রকৃত জ্ঞানের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অনেক শিশু রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটি শিশুকে স্নেহের বশবর্তী হয়ে আমরা আমাদের পুত্র এবং কন্যা

বলে মনে করি, যদিও আমরা ভালভাবেই জানি যে, তারা আমাদের থেকে ভিন্ন। তেমনই, ধনের প্রতি গভীর আসক্তির ফলে, আমরা ব্যাঙ্কে সঞ্চিত কিছু ধন আমাদের বলে মনে করি। ঠিক সেইভাবে আমাদের দেহের প্রতি আসক্তির বশে, আমরা দেহটিকে আমাদের বলে মনে করি। আমি বলি যে এইটি 'আমার' দেহ। তার পর সেই প্রভুত্বের ধারণা বিস্তার করে আমি বলি, "এইটি আমার হাত, এইটি আমার পা," এবং আরও অধিক বিস্তার করে বলি, "এইটি আমার ব্যাঙ্কে সঞ্চিত ধন, এইটি আমার পুত্র, এইটি আমার কন্যা।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি জানি যে, আমার পুত্র এবং আমার ধন-সম্পদ আমার থেকে ভিন্ন। দেহটির বেলায়ও তাই; আমি আমার দেহটি থেকে ভিন্ন। এইটি কেবল উপলব্ধির প্রশ্ন এবং যথার্থ উপলব্ধিকে বলা হয় *প্রতিবুদ্ধ*। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনায় জ্ঞান লাভ করার ফলে, মানুষ মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৪০

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্‌যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥ ৪০ ॥

যথা—যেমন; **উল্মুকাৎ**—অগ্নির শিখা থেকে; **বিস্ফুলিঙ্গাৎ**—স্ফুলিঙ্গ থেকে; **ধূমাৎ**—ধূম থেকে; **বা**—অথবা; **অপি**—ও; **স্ব-সম্ভবাৎ**—নিজে থেকেই উৎপন্ন; **অপি**—যদিও; **আত্মত্বেন**—স্বভাবত; **অভিমতাৎ**—ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; **যথা**—যেমন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **পৃথক্**—ভিন্ন; **উল্মুকাৎ**—শিখা থেকে।

অনুবাদ

জ্বলন্ত অগ্নি যেমন অগ্নিশিখা থেকে, স্ফুলিঙ্গ থেকে এবং ধূম থেকে ভিন্ন, যদিও তারা সকলেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে, পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

তাৎপর্য

যদিও প্রজ্বলিত কাষ্ঠ, স্ফুলিঙ্গ, ধূম এবং অগ্নিশিখা পরস্পর থেকে ভিন্ন থাকতে পারে না, কেননা তারা প্রত্যেকেই অগ্নির বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পরস্পর থেকে ভিন্ন। অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ধূমকে অগ্নি বলে মনে করে, যদিও অগ্নি এবং ধূম সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। অগ্নির তাপ এবং আলোক ভিন্ন, যদিও তাপ এবং আলোক থেকে আগুনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

শ্লোক ৪১

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎপ্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ ।
আত্মা তথা পৃথগ্‌দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৪১ ॥

ভূত—পঞ্চ মহাভূত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অন্তঃ-করণাৎ**—মন থেকে; **প্রধানাৎ**—প্রধান থেকে; **জীব-সংজ্ঞিতাৎ**—জীবাত্মা থেকে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **তথা**—সেই প্রকার; **পৃথক্**—ভিন্ন; **দ্রষ্টা**—দর্শক; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ব্রহ্ম-সংজ্ঞিতঃ**—ব্রহ্ম বলা হয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পরমব্রহ্ম নামে পরিচিত, তিনি হচ্ছেন দ্রষ্টা। তিনি পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয় এবং চেতনা সংযুক্ত জীবাত্মা বা ব্যষ্টি জীব থেকে ভিন্ন।

তাৎপর্য

এখানে পূর্ণ ব্রহ্মের একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। জীব জড় তত্ত্ব থেকে ভিন্ন, এবং পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা, যিনি সমস্ত জড় উপাদানের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ব্যষ্টি জীবাত্মা থেকে ভিন্ন। এই দর্শন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব*-রূপে প্রবর্তন করে গেছেন। সব কিছুই যুগপৎ সব কিছুর সঙ্গে ভিন্ন এবং অভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জড়া প্রকৃতির দ্বারা যে-জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাও যুগপৎ তাঁর সঙ্গে ভিন্ন এবং অভিন্ন। জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, কিন্তু যেহেতু সেই শক্তি ভিন্নভাবে কার্য করছে, তাই তাঁর থেকে ভিন্ন। তেমনই জীবও পরমেশ্বর ভগবানের থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। এই 'যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন' দর্শন ভাগবত পরম্পরার চরম সিদ্ধান্ত, যা এখানে কপিলদেবের দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়েছে।

অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে জীবের তুলনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকে যা উল্লেখ করা হয়েছে—অগ্নি, অগ্নিশিখা, ধূম এবং জ্বালানি কাঠ সবই একত্রে মিলিত হয়েছে। এখানে জীব, জড়া প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর ভগবান পরস্পর মিলিত হয়ে রয়েছেন। জীবের প্রকৃত স্থিতি ঠিক অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো; তা হচ্ছে আগুনের বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতিকে ধূমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অগ্নিও পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। *বিষ্ণু পুরাণে* বলা হয়েছে যে, জড় জগতে অথবা চিৎ-জগতে আমরা যা কিছু দেখি বা অনুভব করি, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির বিস্তার। অগ্নি যেমন এক স্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তার আলোক এবং তাপ

বিকিরণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে তাঁর বিভিন্ন শক্তি বিতরণ করেন।

বৈষ্ণব দর্শনের চারটি মতবাদ হচ্ছে—*শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত* এবং *দ্বৈত*। বৈষ্ণব দর্শনের এই চারটি মতবাদই *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই দুইটি শ্লোকের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

শ্লোক ৪২

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥ ৪২ ॥

সর্ব-ভূতেষু—সমগ্র প্রকাশে; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—আত্মা; **সর্ব-ভূতানি**—সমস্ত প্রকাশ; **চ**—ও; **আত্মনি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ঈক্ষেত**—দেখা উচিত; **অনন্য-ভাবেন**—সমদৃষ্টি সহকারে; **ভূতেষু**—সমগ্র প্রকাশে; **ইব**—যেমন; **তৎ-আত্মতাম্**—তারই প্রকৃতি।

অনুবাদ

যোগীর কর্তব্য সমস্ত প্রকাশে সেই একই আত্মাকে দর্শন করা, কারণ যা কিছু বিদ্যমান তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। এইভাবে ভক্তের কর্তব্য ভেদভাব-রহিত হয়ে সমস্ত জীবেদের দর্শন করা। সেইটি হচ্ছে পরমাত্মা উপলব্ধি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা কেবল প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরেই বিরাজ করেন না, তিনি প্রতিটি পরমাণুর অন্তরেও বিরাজমান। পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সর্বত্রই বিরাজ করছেন, এবং কেউ যখন সর্বত্র পরমাত্মার উপস্থিতি দর্শন করেন, তখন তিনি সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্ত হন।

সর্বভূতেষু শব্দটির অর্থ এইভাবে বুঝতে হবে। চার শ্রেণীর জীব রয়েছে—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ। এই চার শ্রেণীর জীব চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে বিস্তৃত হয়েছে। যে ব্যক্তি জড় উপাধি থেকে মুক্ত, তিনি একই প্রকারের আত্মাকে সর্বত্র অথবা প্রত্যেক জীবের মধ্যে দর্শন করেন। অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে, গাছপালা এবং ঘাস আপনা থেকে মাটি থেকে জন্মায়, কিন্তু যিনি প্রকৃতই বুদ্ধিমান এবং আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন, তিনি দেখতে পান যে, এই

বৃদ্ধি আপনা থেকেই হয় না। তার কারণ হচ্ছে আত্মা, এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জড় শরীর বিভিন্নরূপে প্রকট হয়। গবেষণাগারে গাঁজানোর ফলে, নানা প্রকার কীটাণুর জন্ম হয়, কিন্তু তার কারণ হচ্ছে আত্মার উপস্থিতি। জড় বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, ডিম জীবনহীন, কিন্তু তা সত্য নয়। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ-সমন্বিত জীব উৎপন্ন হয়। পাখিরা ডিম থেকে জন্মায়, এবং পশু ও মানুষেরা জরায়ু থেকে জন্মায়। যোগী বা ভক্তের পূর্ণ দৃষ্টি হচ্ছে যে, তিনি সর্বত্র জীবের উপস্থিতি দর্শন করেন।

শ্লোক ৪৩

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে ।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাত্তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥

স্ব-যোনিষু—কাষ্ঠরূপে; **যথা**—যেমন; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **একম্**—এক; **নানা**—বিভিন্নভাবে; **প্রতীয়তে**—প্রকট হয়; **যোনীনাম্**—বিভিন্ন যোনিতে; **গুণ-বৈষম্যাৎ**—গুণের পার্থক্য হেতু; **তথা**—তেমন; **আত্মা**—আত্মা; **প্রকৃতৌ**—জড়া প্রকৃতিতে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত।

অনুবাদ

অগ্নি যেমন বিভিন্ন প্রকার কাষ্ঠে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, তেমনই জড়া প্রকৃতির গুণের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শুদ্ধ জীবাত্মা বিভিন্ন দেহে প্রকট হয়।

তাৎপর্য

আমাদের বুঝতে হবে যে, দেহ উপাধিযুক্ত। তিন গুণের মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে প্রকৃতি, এবং এই সমস্ত গুণ অনুসারে, কারও শরীর ছোট এবং কারও শরীর অত্যন্ত বিশাল। যেমন একটি বড় কাষ্ঠখণ্ডের আগুন বিরাট বড় বলে প্রতীত হয়, এবং একটি কাঠির আগুন ছোট বলে প্রতীত হয়। প্রকৃত পক্ষে আগুনের গুণ সর্বত্র একই থাকে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির প্রকাশ এমনই যে, ইন্ধন অনুসারে অগ্নিকে বড় এবং ছোট বলে মনে হয়। তেমনই বিরাট শরীরের আত্মা গুণগতভাবে এক হলেও, ক্ষুদ্র দেহের আত্মা থেকে ভিন্ন।

আত্মার ক্ষুদ্র কণিকা ঠিক বৃহৎ আত্মার স্ফুলিঙ্গের মতো। সব থেকে মহান আত্মা হচ্ছে পরমাত্মা, কিন্তু আয়তনগতভাবে পরমাত্মা ক্ষুদ্র আত্মা থেকে ভিন্ন। বৈদিক শাস্ত্রে পরমাত্মাকে ক্ষুদ্র আত্মার সমস্ত আবশ্যকতাগুলির পূরণকারী বলে

বর্ণনা করা হয়েছে *(নিত্যো নিত্যানাম্)*। যিনি জীবাত্মা এবং পরমাত্মার এই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি সমস্ত শোকের অতীত এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন। ক্ষুদ্র আত্মা যখন নিজেকে আয়তনগতভাবে বৃহৎ আত্মার সমান বলে মনে করে, তখন সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, কারণ সেইটি তার স্বরূপ নয়। মানসিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউ বিরাট আত্মায় পরিণত হতে পারে না।

বরাহ পুরাণে বিভিন্ন আত্মার ক্ষুদ্রতা এবং বিশালতার বর্ণনা স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে করা হয়েছে। *স্বাংশ* আত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং *বিভিন্নাংশ* আত্মা বা ক্ষুদ্র কণা শাশ্বতরূপে ক্ষুদ্র অংশই থাকে, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে *(মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ)*। ক্ষুদ্র জীবেরা শাশ্বত অংশ, তাই তাদের পক্ষে কখনই পরমাত্মার সমান হওয়া সম্ভব নয়।

শ্লোক ৪৪

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্ ।
দুর্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ ৪৪ ॥

তস্মাৎ—এইভাবে; **ইমাম্**—এই; **স্বাম্**—নিজের; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতি; **দৈবীম্**—দৈবী; **সৎ-অসৎ-আত্মিকাম্**—কার্য-কারণ সমন্বিত; **দুর্বিভাব্যাম্**—বোঝা কঠিন; **পরাভাব্য**—জয় করার পর; **স্ব-রূপেণ**—স্বরূপে; **অবতিষ্ঠতে**—অবস্থান করেন।

অনুবাদ

এইভাবে মায়ার দুরত্যয়া মোহময়ী প্রভাব জয় করে, যোগী তাঁর স্বরূপে স্থিত হতে পারেন। এই মায়া জড় সৃষ্টির কার্য এবং কারণরূপে উপস্থিত, তাই তাকে জানা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবের জ্ঞান আচ্ছাদনকারী মায়ার প্রভাব জীবের পক্ষে অতিক্রম করা অসম্ভব। কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন তিনি মায়ার এই দুর্লঙ্ঘ প্রভাব জয় করতে পারেন। এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, *দৈবী প্রকৃতি* বা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি *দুর্বিভাব্যা*, অর্থাৎ, তাকে জানা এবং তাকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু মায়ার এই দুর্লঙ্ঘ প্রভাব জয় করতেই হবে, এবং তা কেবল সম্ভব ভগবানের কৃপায়। ভগবান যখন তাঁর শরণাগত আত্মার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন

দুরত্যয়া মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে *স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে* শব্দটিরও উল্লেখ করা হয়েছে। *স্বরূপ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, জীব পরমাত্মা নয়, পক্ষান্তরে, পরমাত্মার বিভিন্ন অংশ; তাকেই বলা হয় *স্বরূপ* উপলব্ধি। ভ্রান্তভাবে নিজেকে সর্ব ব্যাপ্ত পরমাত্মা বলে মনে করা কখনই *স্বরূপ* নয়। সেইটি জীবের প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি নয়। তার প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে যে, সে ভগবানের বিভিন্ন অংশ। এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, জীব যেন তার প্রকৃত *স্বরূপে* অবস্থিত থাকে। *ভগবদ্গীতায়* এই উপলব্ধিকে ব্রহ্ম উপলব্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রহ্ম উপলব্ধির পর ব্রহ্মের কার্যকলাপে যুক্ত হওয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে স্বরূপ সিদ্ধ হয়, ততক্ষণ সে ভ্রান্ত দেহাত্ম-বুদ্ধিতে সক্রিয় হয়। কেউ যখন তাঁর প্রকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, তখনই ব্রহ্ম উপলব্ধির কার্যকলাপ শুরু হয়। মায়াবাদীরা বলে যে, ব্রহ্ম উপলব্ধির পর, সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু বাস্তবে তা কখনও হয় না। আত্মা যদি জড়ের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত তার বিকৃত অবস্থায় এত সক্রিয় হয়, তা হলে মুক্ত অবস্থায় তার কার্যকলাপ কিভাবে অস্বীকার করা যায়? এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। কোন মানুষ যদি তার রুগ্ন অবস্থায় অত্যন্ত সক্রিয় থাকে, তা হলে কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, যখন সে রোগমুক্ত হবে, তখন সে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে? স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সে যখন সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন তার কার্যকলাপ শুদ্ধ হয়। বলা যেতে পারে যে, ব্রহ্ম উপলব্ধির কার্য বদ্ধ জীবনের কার্য থেকে ভিন্ন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্ম উপলব্ধিতে কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, নিজেকে যখন ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করা যায়, তখন ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। *মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*—ব্রহ্ম উপলব্ধির পর, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া যায়। তাই ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে ব্রহ্ম উপলব্ধির কার্য।

যাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের আর মায়ার মোহময়ী প্রভাব থাকে না, এবং তাঁদের স্থিতি সর্বতোভাবে সিদ্ধ। পূর্ণের অংশরূপে জীবের ধর্ম হচ্ছে পূর্ণের সেবা করা। সেটিই হচ্ছে জীবনের চরম সিদ্ধি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন সম্বন্ধে কপিলদেবের উপদেশ' নামক অষ্টবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।